২৩৫

সাংবাদিকতা বুলেটিন

পৌষ ১৪২০
ডিসেম্বর ২০১৩

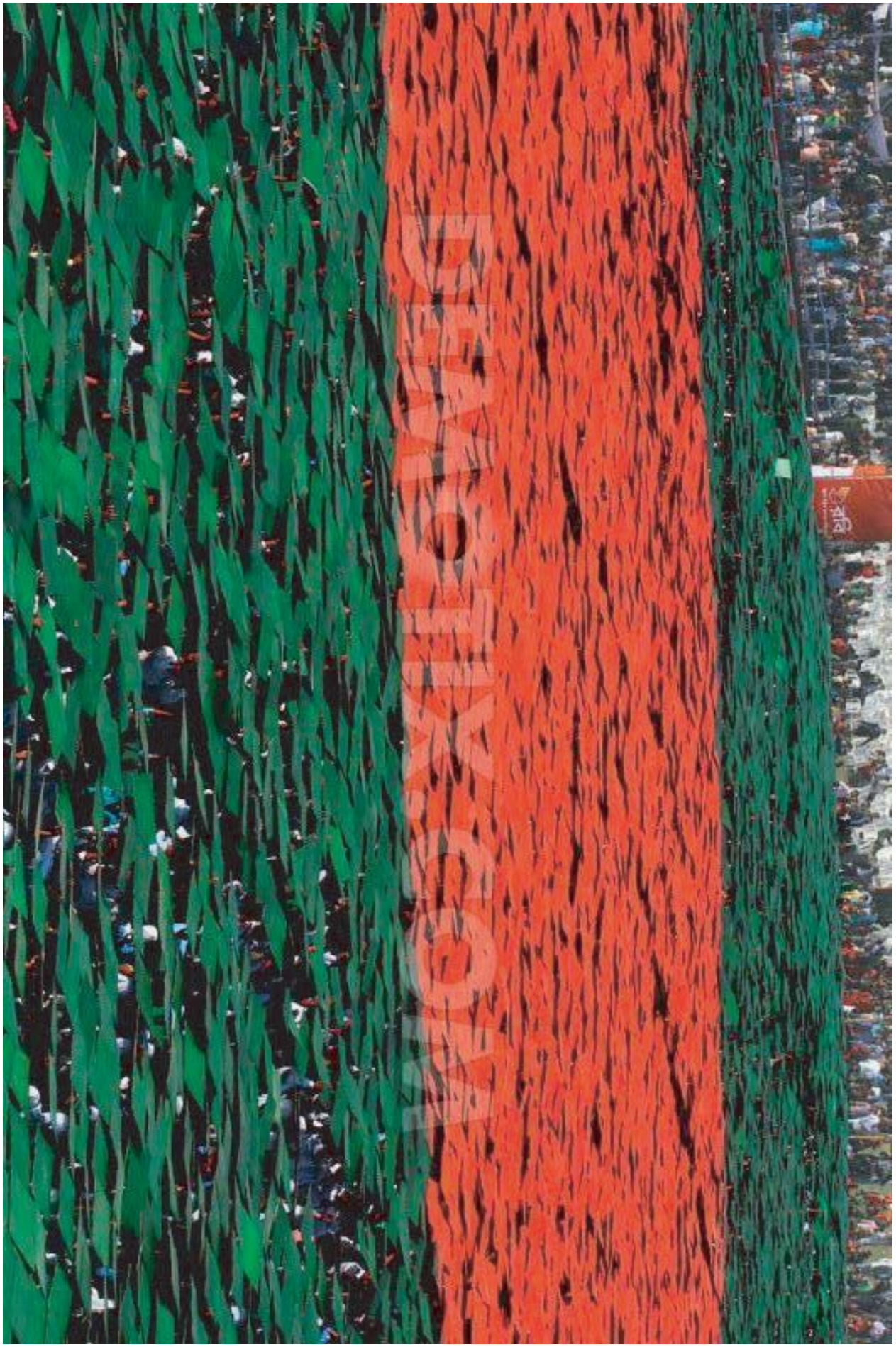

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৩৫ পৌষ ১৪২০ ডিসেম্বর ২০১৩

সূ চি প ত্র

৩ **শফি আহমেদ**
বিদায়ী বিউগল বাজাও বিশ্ববাসী

৮ **শর্বরী আলোময়ী**
এই ডিসেম্বর সেই ডিসেম্বর

১৩ **শাওয়াল খান**
রোকেয়ার স্বপ্ন বনাম বিজ্ঞাপনে নারী

১৯ **রাশেদা নাসরীন**
নোবেল বিজয়ের শতবার্ষিকী
প্রসঙ্গ: *গীতাঞ্জলি*

২২ **এ এম রাশিদুজ্জামান খান**
বাংলাদেশের শিক্ষাভাবনা ও অর্জন

২৫ **শান্তনু দে**
শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়ন

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

শ ফি আ হ মে দ

বিদায়ী বিউগল বাজাও বিশ্ববাসী

চলে গেলেন নেলসন মাণ্ডেলা। দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসাংবাদিত 'তাতা'। মৃত্যুর সংবাদ এত দ্রুত এবং গভীরভাবে ছুঁয়ে গেছে পৃথিবীর এক থেকে অন্য প্রান্তে, এমন দৃষ্টান্তের কথা, শুধু এই সমকালে কেন, কবে কোন কালে ঘটেছিল, তা সন্ধান করার প্রয়াস বৃথা।

আমরা যখন উঁচু ক্লাসের ছাত্র, পৃথিবীর রাজনীতি তখন সুস্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছে। ভিয়েতনাম আমাদের ঘরের কাছের দেশ। সেই দেশে এসে যুদ্ধ করছে বিশ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরের আর এক দেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের চোখে-মুখে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ মার্কিনীদের বিরুদ্ধে। সারা বিশ্বে তখন আদর্শগতভাবে দুই পৃথক রাজনৈতিক বলয়ের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলছে। একটা খুবই যুৎসই নাম ছিল তার, Cold War বা শীতল যুদ্ধ। সেই কালে, সঙ্গত কারণেই মার্কস-লেলিনের কথা আমাদের মুখে খইয়ের মত ফুটতো; জনসভা, চায়ের দোকান, কফি হাউস থেকে ক্লাবের আড্ডায় সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিনিয়তই তুলোধুনো করছি আমরা। স্বাভাবিক কারণেই মাও-সে-তুঙের নামও ঘুরে ফিরে আসত। তবে আর একটি নাম উচ্চারিত হত আমাদের আলাপ-আলোচনায়, হয়ত সংখ্যার গণনায় তা ছিল ওই আগে উল্লেখ করা তিনজনের তুলনায় কম বার, তবে সেই নাম- নেলসন মাণ্ডেলা- উচ্চারিত হত পরম বিস্ময় ও শ্রদ্ধায়।

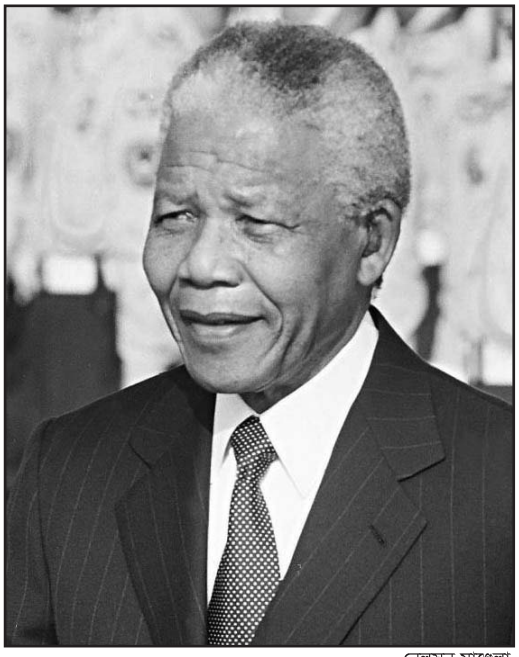

নেলসন মাণ্ডেলা

দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগারে বন্দী বর্ণবাদবিরোধী এক হার-না-মানা নেতা নেলসন মাণ্ডেলা। খুব স্পষ্টভাবেই মনে করতে পারি, ছাত্রাবস্থায়, তখনকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি বিবেচনায়, আমাদের এমন মনে হয়েছিল যে, এই এমন একজন মানুষ যিনি জীবিত অবস্থায় কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। এই মুক্ত পৃথিবীতে বসবাসের অধিকার আর কোনদিন ভোগ করা হবে না মাণ্ডেলার। আমাদের সেই উদ্ধত এবং উদ্দীপ্ত যৌবনে নেলসন মাণ্ডেলা ছিলেন মর্ত্যলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমিথিউস। জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় এসে সেইসব কথা রোমন্থন করতে গিয়ে আজও শিহরিত বোধ করি। তিনি চলে গেলেন। তাঁর প্রতি আমাদের আনত প্রণাম জানাই।

শিহরণের এক অপ্রত্যাশিত ও প্রায় দৈব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। নির্দিষ্ট তারিখটা মনে নেই, তবে মে মাস। (কেন যে নিত্যদিনের ডায়েরি লিখি না, নিজের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবনের কথকতাও যে কত মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে!) ওই বছর এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে একটা বিশেষ ধরণের বৃত্তির অধীনে আমি গিয়েছিলাম বার্লিনে, ঢাকায় শেখা জর্মন ভাষাটা আরও একটু ঘষামাজা করা হবে ওখানকার গ্যেটে ইনস্‌টিটিউটে এবং সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের নাট্যপ্রদর্শনী দেখার সুযোগ।

ওই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচিত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি হিসেবে, বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে নির্ভীক ও উচ্চকণ্ঠ নেতা হিসেবে এবং বলতে গেলে সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নেলসন মাণ্ডেলা এসেছিলেন বার্লিনে। (উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১৯৯৩ সালে মাণ্ডেলা নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে এতে আমার আনন্দ পূর্ণাঙ্গ ছিল না। কারণ, মাণ্ডেলা এবং ডব্লিউ বি ক্লার্ককে যৌথভাবে এই পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। মনে হয়, শ্বেতাঙ্গ দুনিয়া তখনও মাণ্ডেলার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেনি।) গ্যেটে ইনস্‌টিটিউটের একটা ছোট নোটিশে জানানো হল, নেলসন মাণ্ডেলা কংগ্রেস ভবনে পাবলিক লেকচার দেবেন, তা শুনতে আগ্রহী বার্লিনে শিক্ষাগ্রহণরত বিদেশী শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন, তার মধ্য থেকে দু'জনকে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করবেন। আমার কপাল অনেক চওড়া হলেও প্রায় সবসময়ই ভাগ্যের আনুকূল্য পাই না। কিন্তু কী আশ্চর্য! মাণ্ডেলা

বার্লিনে পৌঁছানোর ঠিক আগের দিন ইনস্‌টিটিউটের পরিচালকের সহকারী সদা স্মিতহাসি তরুণী (এখন আর নাম মনে নেই) আমাকে বিস্ময়ে বিহবল করে দিয়ে আমার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বলল, আমি যেন, দেড় ঘন্টা আগে গিয়ে হাজির হই। অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয় এক বিকেল আমার জন্য অপেক্ষা করেছে!

উত্তেজনার প্রশমনে সেই সন্ধ্যায়ই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গোলাম মুরশিদকে ফোন করলাম লণ্ডনে। আমার আসন ছিল দ্বিতীয় সারির ডান দিকে। ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর সেই অনির্বচনীয় বক্তৃতার শেষে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে আপ্লুত করেছিলেন। সামনের দিক থেকে অনুষ্ঠান শেষে আমরা প্রায় সবাই এগিয়ে গিয়েছিলাম করমর্দন করতে। তিনি আমার হাতও ছুঁয়েছিলেন। এ-ও হয়? তা-ও আমার ভাগ্যে?

সবার জীবনেই এমন অসাধারণ অবাক করা এবং আকস্মিক কিছু মুহূর্ত তৈরি হয়, যা সত্যিই অবিস্মরণীয়। মাণ্ডেলাকে আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখা, তাঁকে আমি একটা প্রশ্ন নিবেদন করলাম, তিনি তার উত্তর দিলেন, বহু মানুষের ভিড় যদিবা, তবুও তিনি আমার সঙ্গেও করমর্দন করলেন। এমন মুহূর্তটাকে সত্যিই সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে স্মৃতির সবচেয়ে সংরক্ষিত কোঠায় রেখে দিয়েছি। খুবই একান্ত, অর্থময়, গৌরবময় এবং সর্বোপরি যেন মোহময়।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে নেলসন মাণ্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত ও সুলেমান ডোমিরেল

ইতিহাসের অনুকূল পরিক্রমায় এক বছরেরও কম সময়ের দূরত্বে আবার ওই মহামানবকে দেখলাম, আমাদের এই দেশে, বাংলাদেশে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে। ঢাকায়, রমনার সেই মাঠে, যেখানে জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে বজ্রনির্ঘোষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই উদ্যানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাতির জনক নেলসন মাণ্ডেলা। এবার অবশ্য আর সামনের দিকের সারিতে নয়, মাঝখান পেরিয়ে প্রায় শেষের দিকে। অনেক অনুরোধ ও অনুনয় করার পর একজন রাজনৈতিক নেতার আনুকূল্যে ১৯৯৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ওই ঐতিহাসিক সমাবেশে প্রবেশ করার সুযোগ ঘটেছিল। ওই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আর এক কিংবদন্তী সংগ্রামী ফিলিস্তিনীদের অবিসাংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং তুরস্কের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সুলেমান ডোমিরেল।

এ এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। রমনার সবুজ চত্বর, ওপরে আকাশের উদার নীল, আর উদ্যানে সম্মিলিত মানুষের ঢল, যারা এক অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাভ করা স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। সবাইকেই দেখছি আমি একটু দূর থেকে, তবে নেলসন মাণ্ডেলার দিকেই চোখটা অনেক বেশি আবদ্ধ হয়েছিল। তরুণ-সুলভ একটা চপল উত্তেজনা আমাকে তাড়িত করছিল, ভাবছিলাম, যদি একবার তাঁর কাছে যেতে পারতাম, আর একবার হাতটা ছুঁতে পারতাম, তিনি আমার হাতটা ছেড়ে দেবার আগেই দ্রুত এই কথা জানিয়ে দিতাম যে, গত বছর বার্লিনের কংগ্রেস হাউসে আমি উপস্থিত হয়ে আপনার অনিন্দ্যসুন্দর ভাষণ শুনেছি, আপনি আমার একটা অভাজন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আজ আপনার উচ্চারিত গভীর শব্দমালায় সেই অনুভবকে পুনরাবিষ্কার করলাম।

মনে পড়ে, ১৯৮৮-৮৯ সালে বেশ কিছুটা সময় আমি ইংল্যাণ্ডে ছিলাম। আমার লেখাপড়ার জায়গাটা ছিল ইয়র্কশায়ারের লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়। তবে উইক এণ্ড যোগ আর একদিন ছুটি থাকলেই চলে আসতাম লণ্ডন শহরে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাশোনা, বাড়তি কিছু বিনোদন, বন্ধু গোলাম মুরশিদের আনুকূল্যে বিবিসি-র বাংলা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বাড়তি কয়েকটা পাউণ্ড রোজগারের হাতছানি ছিল। তখনও নেলসন মাণ্ডেলা কারাগারে। গণতন্ত্রের পতাকা সবসময় পত পত ওড়ালেও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি যে সেই সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের অনুকূলে ছিল, তা বলার কোন উপায় নেই। মধ্য লণ্ডনের চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে এসে পাতাল থেকে সমভূমিতে উঠলে নেলসন স্কয়ার। তার ডান দিকে শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকার দূতাবাস। যতবারই গেছি, দেখেছি কালো অভিবাসী দক্ষিণ আফ্রিকান মানুষের ছোট ছোট দল নেলসন মাণ্ডেলার মুক্তির দাবিতে

নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। বেশ কয়েকবারই ওইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নৈতিক ও আত্মিকভাবে সংহতি জ্ঞাপন করেছি। সেই সময় আমার একবারও মনে হত না যে, নেলসন মাণ্ডেলা কোনদিন জেল থেকে মুক্তি পাবেন।

বিলেতের সূত্রে আর একটা ছোট অথচ আমার জন্য পরম কাঙ্ক্ষিত স্মৃতিচারণের লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ১৯৯৫ সালে অন্য আরেক বারের লণ্ডন ভ্রমণের সময়ই প্রকাশিত হয়েছিল নেলসন মাণ্ডেলার অসাধারণ রাজনৈতিক আত্মজীবনী *Long Walk to Freedom*। লণ্ডনের বিশাল বিশাল সব বইয়ের দোকানে হাজার হাজার বই নেড়েচেড়ে, কখনোবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা পৃষ্ঠা পাঠ আমার মত অনেকেরই অভ্যাস। বই কেনার আগ্রহটাকে আর্দ্রতায় চুপসে দেয় আমার পকেটের সামর্থ্য। মাণ্ডেলার আত্মজীবনী নাড়াচাড়া করছি। দেশে ফেরার আগে অবশ্যই একটা কপি কিনে নিয়ে যাব। রাতের ডিনার খাবার সময় গল্প করতে করতে বন্ধু মুরশিদকে সেকথাও বললাম। পরদিন সন্ধ্যায় মুরশিদ *Long Walk to Freedom* সহ আর তিনটি বই আমাকে এনে দিয়ে বলল, বিবিসি বাংলা বিভাগের জন্য এগুলি একসঙ্গে রিভিউ করে যান। রেকর্ডিং একদিনেই করা হবে। সম্প্রচার করা হবে বিভিন্ন বিরতিতে। সেও যে কী উত্তেজনা আমার মধ্যে। ওই স্বল্প দৈর্ঘ্যের আমার পর্যালোচনা শুনে বেশ কয়েকজন বন্ধু ভালই তারিফ করেছিলেন। নেলসন মাণ্ডেলা আর নেই। তাঁর চলে যাবার সংবাদ বিগত তিন দিন ধরে পৃথিবীর সকল সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম। এত ফুল, এত দৃশ্য-অদৃশ্য অশ্রু আর কবে দেখেছে বিশ্ব? তাঁর মৃত্যুতে দুনিয়াজোড়া বিলাপ, আবার দেশীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকবৃন্দ গান গাইছে, সম্মেলক নৃত্যে অংশগ্রহণ করছে। বিবিসি ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু তাঁকে নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে, নানাজনের পর্যবেক্ষণকে সংগ্রথিত করেই যেন সকলের শোকের বার্তার এক বিচিত্র মালা গাঁথা চলছে।

শুক্রবার সকালে উঠেই এ্যাসেজ সিরিজের দ্বিতীয় খেলার ওইদিনের কি অবস্থা দেখার জন্য যখন টেলিভিশন চালু করলাম, প্রথমেই দেখলাম স্টুয়ার্ট ব্রডের বাহুতে কালো ব্যাজ, অন্যদের ক্ষেত্রেও তাই। কি হলো, প্রথমেই মনে হল, ইংল্যাণ্ডের কোন প্রবীণ ক্রিকেটারের জীবনাবসান ঘটেছে। আমার ঔৎসুক্য অতটা প্রবল ছিল না। একটু পরেই দেশের সাম্প্রতিক দিনগুলির নিত্যসংঘর্ষের অবস্থাটা কি, তা জানার জন্য যখন দেশীয় একটা চ্যানেলে দৃষ্টি ফেরালাম, চায়ের কাপটা ঠোঁটে ছোঁয়ানোর আগে হাত থমকে গেল, নিচের স্ক্রলে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আর নেই, নেলসন মাণ্ডেলার তিরোধানের সংবাদে নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম।

যেন সত্যিই এক পরম স্বজনকে হারানোর কষ্ট আমাকে নিথর করে রাখলো অনেকটা সময় ধরে। যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বিবিসি চ্যানেল খুললাম। সবার কথা শুনছি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন শহরের দৃশ্য দেখছি, দেখলাম ইতিহাস গড়ে তোলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বলছেন, তাঁর কণ্ঠ আন্তরিকভাবেই আবেগার্ত, তিনি বললেন, He (নেলসন মাণ্ডেলা) fought against white domination; he fought against black domination; একথাও বললেন নেলসন ম্যাণ্ডেলার জীবন থেকে তিনি অনেক গভীর অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তিনি বললেন, আজ আমরা এই বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী, সবচেয়ে সাহসী ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকে হারিয়েছি। তিনি (মাণ্ডেলা) শুধু সমকালীন বিশ্বের নন, তিনি মহাকালের, অনাগত কালের। খুব স্বাভাবিক কারণেই আমার চোখ ভিজে আসছিল।

তখন ওই আবেগঘন মহূর্তে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আমার মনে পড়ে গেল ১৯৮৬ সালের আর এক বিকেলের কথা। ওই বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাস মিলিয়ে আমি ছয় সপ্তাহের জন্য মার্কিন কবি রবার্ট লোয়েলের ওপর কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গিয়েছিলাম ভারতের হায়দ্রাবাদে। ওখানেই রয়েছে এসব বিষয়ে গবেষণা করার সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক কেন্দ্র American Studies Research Center। এক বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দু'জন সাধারণ মানের কর্তাব্যক্তি এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা তাঁদের উপস্থাপনায় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির গুণাবলি, ন্যায্যতা এবং বিশেষভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে তাদের উচুঁ মাপের দায়বদ্ধতার কথা বলেছিলেন।

১৯৮৬ সাল, মাণ্ডেলা তখনো কারাগারে বন্দী, কখনো মুক্ত হবেন কি না, তার কোন ধূসররেখাও দৃশ্যমান নয়। প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমরা যে এত বড় বড় কথা বলছো, কিন্তু মাণ্ডেলার মুক্তির সপক্ষে কোন অবস্থান কেন গ্রহণ করছো না; দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো মানুষদের ওপর যে বিরতিহীন নিপীড়ন চলছে, তার প্রবল নিন্দা করছো না কেন; আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস সাধারণ দরিদ্র মানুষের অধিকার আদায়ে যে সংগ্রাম করছে, তোমরা তো পরোক্ষভাবে আসলে তার নিন্দা ও সমালোচনা করছো, এসব বিষয়ে তোমাদের ব্যাখ্যা কি? ভদ্র মহোদয়দ্বয় প্রাথমিকভাবে বেশ ভড়কে গিয়েছিলেন, আর ওঁরা কোন দুঁদে কূটনীতিকও ছিলেন না; তা ছাড়া ভারতের হায়দ্রাবাদে তাদেরই অর্থসম্পদ ও আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত এই আমেরিকান সেন্টারে কাজ করতে এসে বাংলাদেশের একজন দরিদ্র অধ্যাপক কি না আঞ্চলিক বিষয় বাদ দিয়ে নেলসন মাণ্ডেলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কালা আদমিদের অধিকার এবং সেই প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে তাদের সঙ্গে সওয়াল করবে, এমনটি তারা কোনভাবে ভাবতে পারেনি।

যাই হোক, মোটামুটি একটা বড় হলঘরে আরো অনেক মানুষ তো আছেন এবং তাদের শতকরা নব্বই ভাগই আমার মত বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই বা দিদিমণি। নিঃশব্দে ঢোক গিলে ওদের একজন যা বললেন, তা এরকম।

তারা মনে করে, দক্ষিণ আফ্রিকার (তৎকালীন) স্থিতাবস্থা নষ্ট করে যদি সাদাদের মোড়লগিরি খর্ব এবং কালোদের অধিকার প্রাপ্তির বিষয় বাস্তবায়ন করতে হয় এবং সর্বোপরি নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে যদি মুক্তি দেয়া হয়, তাহলে তাঁর নেতৃত্বে কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রবল আন্দোলনে সাদা মানুষদের হত্যা করা হবে, সাদাদের ওপর নিপীড়ন করা হবে, তাতে যে সহিংসতা ঘটবে তার চেয়ে বর্তমান ব্যবস্থা অর্থাৎ White domination-ই ভাল। উত্তরটা উপস্থিত প্রায় সবাইকেই মর্মাহত করেছিল।

আর এখন তো এটা ইতিহাস যে, নেলসন মাণ্ডেলা মুক্তি পাবার পর কী অসীম দক্ষতা, উদারতা ও আন্তরিকতায় আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির অমন কপট যুক্তি এবং আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। বারাক ওবামার কথা শুনতে শুনতে আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল সাতাশ বছর আগের ওই দুই চতুর আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির উকিলের সাদা মুখমণ্ডল।

মাণ্ডেলার বিদায়: কাঁদো পৃথিবী কাঁদো

বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদে বারাক ওবামার প্রতিক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, তার একটা বড় কারণ হল,– দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তেই দেশটিকে সবচেয়ে শক্তিধর বলে বিবেচনা করা হয়। আরও একটা বড় কারণ এই যে, এইমাত্র কয়েক দশক আগে পর্যন্ত খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বর্ণবাদ একটা ভয়ানক সমস্যা হিসেবে অস্তিত্বমান ছিল এবং এখনও এই সমস্যা সামাজিকভাবে অন্তর্হিত হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ হল, বারাক ওবামা নিজেও একজন কৃষ্ণাঙ্গ এবং তিনি সকৃতজ্ঞ ও আন্তরিক স্বরে বলেছেন যে, নেলসন মাণ্ডেলার জীবন ও সংগ্রাম তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। মাণ্ডেলার আদর্শ ওবামা কতটা বাস্তবায়ন করতে পারছেন বা পারবেন সে প্রশ্নটা থেকে গেলেও কৃষ্ণাঙ্গ কোন ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে পাওয়ার ঘটনাই কিন্তু কোটি কোটি কালো মানুষকে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত করেছিল।

সাতাশ বছরের বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পাওয়া নেলসন মাণ্ডেলা প্রথমেই তাঁর দলের মানুষদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, কালোদের প্রতি সাদাদের শতাব্দীপ্রাচীন বৈষম্য ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সত্যটাকে অনুরূপ প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে না এবং তা ঠিকও না। অথচ এটা তো সত্য, দেশটির আদি অধিবাসী তারা হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার বহু শহর ও গ্রামাঞ্চলের শত শত মাইল সংরক্ষিত এলাকা ছিল যেখানে কালো মানুষরা প্রবেশ করতে পারত না। কত ছোটখাট কারণে কালো মানুষের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে, কত নিরাপরাধ কালো ব্যক্তিকে সাদা পুলিশ নির্বিচার হত্যা করেছে। সুদীর্ঘ কালের এমন জমে থাকা ক্ষোভকে শুধু অহিংসা ও শান্তির বাণীর সাহায্যে উপশম করা দুঃসাধ্য। ইউরোপ-আমেরিকার প্রতাপশালী শ্বেতাঙ্গ নেতৃবৃন্দের অনেকেই বিশ্বাস করতে সমর্থ ছিলেন না যে, তা সম্ভবপর। সেই দুঃসাধ্য কাজটাও সম্পন্ন করেছিলেন নেলসন মাণ্ডেলা।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে যখন তিনি আবার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, তখন শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত কিছু বাস্তব বিলাপ অথবা রোবন দ্বীপের কারাগারে তাঁর ওপর কী নিষ্ঠুর মাত্রার নির্যাতন করা হত, সাদা মানুষরা তাঁকে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছিল, যদি তার নিছক সত্যাশ্রয়ী সামান্য বিবরণ দ্বারা মানুষকে আন্দোলিত ও উত্তেজিত করতে চাইতেন, তা হলে সাদা শাসকদের গোলাগুলিতে হাজারো কালো মানুষ নিহত বা আহত হলেও ওই দেশে সাদা মানুষদের অস্তিত্ব হয়তবা নিঃশেষিত হয়ে যেত।

একজন মহামানবিক নেতা হিসেবে তা জানতেন বলেই, বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষ সকল দক্ষিণ আফ্রিকানকে ঐক্যবদ্ধ করার এক অবিশ্বাস্য পরিকল্পনায় তিনি সহিংসতার পথ পরিহার করেছেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের অসামান্যতা। মার্টিন লুথার কিংসহ সকল সংগ্রামীদের প্রতি সবিনয় শ্রদ্ধা জানিয়েও এই কথাটা উল্লেখ করতে চাই যে, নেলসন মাণ্ডেলা কারাগারের নির্যাতন সইবার সময়েও মানবিকতার অমিত শক্তিতে বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই ছিলেন ইতিহাসের বিচক্ষণতম রাষ্ট্রনায়ক। হাজার হাজার মানুষ যেখানে শুধু কালো বলেই বর্ণবাদী নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, তাদের চেতনার গভীরে কোন্ মন্ত্র পৌঁছে দিলে তারা প্রতিশোধের বদলে সহাবস্থানের পক্ষে সমর্থন দেবেন, সেই যাদুকরী এবং মহামানবিক নেতৃত্ব ছিল নেলসন মাণ্ডেলার মধ্যে। এভাবেই সারা বিশ্বে তিনি জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। ইতিহাস বোধ হয় আর কোনদিন এমন মহাসামুদ্রিক হৃদয়শক্তির নেতাকে দেখতে পাবে না।

এমন একটা বাক্য রচনার মধ্য দিয়ে নেলসন ম্যাণ্ডেলার আত্মিক শক্তি ও সমুদ্রসম হৃদয়ের উদারতার কিছুটা পরিচয় দেয়া যায়

বলেও মনে হয় না। তিনি জেলে থাকার সময়ও দক্ষিণ আফ্রিকার যে শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট তাঁকেসহ কালো মানুষদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই ডব্লিউ ক্লার্ককেই তিনি আবার যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তিনি তাঁকে যুক্তও করেছিলেন দেশশাসনে। পৃথিবীর কোথাও কোন কালে এই ধরনের উদারতা ও দূরদর্শিতা এবং সর্বজনকে আপন বৃত্তে মিলিত করার কোন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমাদের জানা নেই। ১৯৬৪ সালে যে শ্বেতাঙ্গ বিচারক তাঁকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন, ত্রিশ বছর পর ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যকর গ্রহণ করার পর সেই বিচারককেই তিনি একান্তভাবে চা-পানে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সেই অতিথির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে একবারও নেলসন মাণ্ডেলা ওই অমানবিক রায় অথবা তাঁর নিজের দুর্বিসহ কারাগারজীবন সম্পর্কে একটা কথাও বলেননি।

এমন একজন মহামানব এই পৃথিবীতে এই সমকালে, যখন ড্রোন প্রযুক্তিতে শুধুই সন্দেহের বশে কত নিরপরাধ নারী ও শিশু হত্যা করা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে বেঁচেছিলেন তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। নেলসন মাণ্ডেলা আমাদের অভিজ্ঞতায়, চোখের সামনে একজন পৌরাণিক চরিত্র হয়ে ওঠেন। দেশ শাসনে তিনি যে সাদা মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন শুধু তাই নয়, সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানে যাতে একটা ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষ কাঠামো গড়ে ওঠে, তার প্রতিফলন ঘটাতে মাণ্ডেলা সদাসচেষ্ট ছিলেন।

শ্বেতাঙ্গ শাসনকালে জাতীয় কোন দলে কোন কালো মানুষ খেলার সুযোগ পায়নি। সঙ্গত কারণেই, এতকালের বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে, দাবি উঠেছিল, কালোদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। মাণ্ডেলা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, সামর্থ্য ও দক্ষতাই হবে যোগ্যতার মাপকাঠি, বঞ্চনা বেদনা এবং বর্ণবাদের ক্ষোভ দিয়ে তার সমাধান করা যাবে না।

ক্রীড়াক্ষেত্রে নেলসন ম্যাণ্ডেলার আচরণের একটি দৃষ্টান্ত এখনো পৃথিবীব্যাপী অকল্পনীয় ও বিস্ময়কর হিসেবে পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকার রাগবি দলে কোনদিন কোন কালো মানুষের জায়গা হয়নি, এই প্রাথমিক কারণে যে, এই খেলায় খেলোয়াড়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়াজড়ির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বহু কালো মানুষের বেদনার কথা মস্তিষ্কে ধারণ করে রাষ্ট্রপতি নেলসন মাণ্ডেলা রাগবি জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে উপস্থিত হন, বর্ণবাদী রাগবি খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করার জন্য মাঠে নেমে আসেন। সারা দুনিয়ার মানুষ বিনম্র চিত্তে এই উদাহরণ দেখতে পান টেলিভিশনের কল্যাণে, সাদা-কালো সব মানুষের কাছেই তা কোন পার্থিব অভিজ্ঞতা ছিল না, এটাকে 'দৈব' ছাড়া অন্য কোন বিশেষণে ভূষিত করা যাবে না। এবং সেই দেবতার নাম নেলসন মাণ্ডেলা।

তিনি চলে যাবার পর সব গণমাধ্যম, তাবড় সব বিশ্বনেতা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক– সকলেই তাঁকে বর্ণবাদীবিরোধী এক অবিসাংবাদিত নেতা হিসেবেই উল্লেখ করছেন। অবশ্যই নেলসন মাণ্ডেলা সম্পর্কে এর চেয়ে মহান, সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ কোন বিবেচনা থাকতে পারে না। এর একটা বড় কারণ, হয়ত আজকের দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখান থেকে বর্ণবাদ বিলুপ্ত হবে এমন কথা চিন্তাও করা যায়নি তিন দশক আগেও, হয়ত বারাক ওবামার সিংহাসন আরোহণ, হয়ত সাহিত্যে আফ্রিকা মহাদেশের নোবেল বিজয়, হয়ত এ্যাথেলেটিকস্ জগতে কালো মানুষদের ক্রমবর্ধমান জয়জয়কার, এতকিছুর পরও। এই সবকিছুতেই যেন জড়িয়ে আছে মাণ্ডেলার নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব।

বর্ণবাদ বিরোধী আরো অনেক নেতার কথা আমরা জানি, কিন্তু তাঁর মহাপ্রস্থানের পর বিশ্বনেতৃবৃন্দ কাছাকাছি কোন মানুষের সন্ধানে শুধু মহাত্মা গান্ধীর কথা মৃদুভাবে উচ্চারণ করেছেন। মাণ্ডেলা একটা ভীষণ নিষ্ঠুর বর্ণবাদী সমাজে জন্মেছিলেন, বেড়ে উঠেছিলেন, বর্ণবাদই অনিবার্যভাবে তাঁর মনোযোগ এবং কর্মের এলাকা হয়ে ওঠে, কিন্তু তাঁর দর্শন (vision) ছিল আরো অনেক বড়, মহৎ ও সুউচ্চ। সাদা-কালো সব মানুষই যখন এমন আধিদৈবিক ব্যক্তির আচরণ, নেতৃত্ব ও উদারতায় বিমোহিত, যখন তিনি চাইলেই আমৃত্যু দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে সমাসীন থাকতে পারতেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর উপস্থিতি ও নির্দেশনার কী অপরিসীম শক্তি, সেই তিনি পাঁচ বছর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করার পর নিজেকে নেতৃত্বের স্থান থেকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নিলেন। সমগ্র বিশ্বে এই দৃষ্টান্ত বিরল। অহিংসা ছাড়া এই একটা জায়গায়ও তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহোদর।

বর্ণবাদ মানে তো ঐতিহাসিকভাবে সাদা মানুষের আধিপত্য এবং কালোদের নিপীড়িত হবার অভিজ্ঞতা। নেলসন মাণ্ডেলা অবশ্যই সেই ঘৃণ্য ব্যবস্থাকে মহান প্রতিবাদী মৈত্রীতে রূপান্তর করার আন্তরিক ও কার্যকর প্রচেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, 'সবার বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে' এমন আকাঙ্ক্ষার স্বরলিপি যিনি জীবন ও কর্মে বাস্তবায়ন করতে পারেন, তাঁকে শুধু 'বর্ণবাদী বিরোধী' অবিসাংবাদিত নেতা বললে, আমার বিচারে অনেকটা ঘাটতি থেকে যায়। বারাক ওবামা যে তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র আমেরিকায় পাঁচ দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তাতে আমেরিকান বর্ণবাদের পক্ষে অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। নেলসন মাণ্ডেলা মৃত্যুপথ যাত্রী একথা জেনেও যে ওবামাসহ সারা দুনিয়ার মানুষ যে আজ বিশ্ব রাজনীতিতে শূন্যতার সুগভীর অনুভবে আচ্ছন্ন হয়েছেন, তার কারণ এই পৃথিবীতে সাধারণের মাঝে জন্ম নেয়া শেষ পৌরাণিক ব্যক্তিটা আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শ র্ব রী আ লো ম য়ী

এই ডিসেম্বর সেই ডিসেম্বর

আমাদের জন্য ডিসেম্বর মাসের একটা আলাদা আবহ আছে, অর্থবহতা আছে। প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণে ডিসেম্বর (যা বঙ্গাব্দের অনুসরণে অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাস) এই অঞ্চলে খুশির বার্তা নিয়ে আসে। সোনালী পাকা ধান কাটার পর তা জড়ো করা হয় উঠোনে, তারপর তা দিয়ে আমাদের গোলা ভরে ওঠে। কৃষকের পরিবারের সবার মুখে তখন শীতের রুক্ষতা ছাপিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি। পিঠা-পুলির আয়োজনে শিশু-কিশোরদের ভেতরে উত্তেজনা সংক্রামিত হয়ে যায়। এমনকি ভূমিহীন যে কৃষিজীবী, তার অভাবের বাস্তবতাও অন্তর্হিত হয়ে যায় কিছুদিনের জন্য। মফঃস্বলে সন্ধ্যার পর শোনা যায় গানবাদ্যির আনন্দময় শব্দ। ডিসেম্বরের এমন সামাজিক-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরং স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়ে ওঠা মধ্য-ডিসেম্বরের সেই রক্তাক্ত যুদ্ধশেষের সফল পরিণতিতে যে রাজনৈতিক উপাদান সংগ্রথিত আছে, সেটাই এই লেখার উপজীব্য।

বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা সবাই জানি, ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। এই মাসের প্রথম দিন থেকেই এটাকে বিজয়ের মাস বা মুক্তির মাস হিসেবে চিহ্নিত করে খবরের কাগজের প্রথম বা শেষ পাতায় আলাদা করে সংবাদ-কলাম ছাপা হয়। তার অনেকটা সেই একাত্তরের দিনগুলির ঘটনা রোমন্থন, অনেকটা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট ও প্রয়োজনীয় তথ্যের পুনরাবৃত্তি। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের সম্প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় অবিশ্বাস্য গতিতে। সব ক'টা টেলিভিশনের পর্দায় একাত্তরের সেই ডিসেম্বরের নির্বাচিত তথ্য ও দৃশ্য সন্নিবেশন করে প্রদর্শন করা হয়। অদূর অতীতের সেইসব দিনের রোমহর্ষক নানা ছবি দেখে দেশের মানুষ শিহরিত বোধ করে। বিশেষ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী মানুষেরা ওইসব দৃশ্য দেখে স্মৃতিকাতরতায় বিহ্বল বোধ করেন। সেই ডিসেম্বর আমাদের একবার বাক্‌হীন করে তোলে, আবার পরক্ষণে উত্তেজনায় কাঁপিয়ে দিয়ে বুকের ভেতর আঁকড়ে রাখা জয় বাংলা' ধ্বনিকে দেশের সব দিগন্তে ছড়িয়ে দিতে চায়; একবার আমাদের চোখে নিয়ে আসে অবাধ অশ্রু যুদ্ধজয়ের বিপুল আনন্দে, এক চোখে যখন এই ধারা, অন্য চোখে তখন শহীদ আত্মীয়-পরিজনদের বিয়োগ-বেদনার জল ঝরতে থাকে, আবার ওই ইতিহাসের পথচলায় যেসব প্রত্যাশা জন্ম নিয়েছিল স্বাভাবিক ধারায়, সেগুলো যে পথ হারিয়ে এলোমেলো হয়ে গেল, আমাদের জীবনের আঁধার-বেলার আশঙ্কা যে এত দীর্ঘায়ু হল, তাতে পরাস্ত ও বিপর্যস্ত বোধ করি। বলা যায়, একাত্তরের সেই ডিসেম্বরের একেবারে প্রথম দিন থেকেই যেন বিজয়ের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের সর্বত্র অথবা ভারতের অসংখ্য শরণার্থী শিবিরে অথবা লণ্ডন নিউ ইয়র্কের মত প্রবাসী বাঙালি অধ্যুষিত সকল অঞ্চলে। দেশের ভেতরে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধের ঘনঘটা, জীবনপণ করা একটা যুদ্ধের সমাপন তো এমনই হয়। ডিসেম্বর বৃষ্টিহীন, তবুও এই আমাদের দেশের মাটি কী ভয়ানক আর্দ্র, লাখ লাখ মানুষের রক্ত তখনো শুষে নিতে পারেনি এদেশের উর্বর মৃত্তিকা। তবে রণাঙ্গনে তখন সমাপনী দামামার বিরতিহীন শব্দ।

মধ্য-ডিসেম্বরের সেই অমৃত বিকেলে নিয়াজী স্বাক্ষর করে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, আমাদের স্বল্প-প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে অহমিকায় ফুঁসে ওঠা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর উদ্ধত শির। তা-ও আবার সেই বাহিনী তৎকালীন পৃথিবীর সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত। সেই ডিসেম্বরে এমন অর্জন সম্ভব হয়ে উঠেছিল। যে ষোলই ডিসেম্বর তারিখে আমাদের সর্বাত্মক ও আনুষ্ঠানিক বিজয় অর্জিত হয়েছিল এবং যে অনুপম সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে মাত্র কয়েক ঘন্টার ভেতরে, তারও আগে থেকেই অবশ্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে ভেসে আসছিল বিজয়ের সংবাদ। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বুঝতে পারছিল যে, অবিশ্বাস্য মনোবল ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল মুক্তিসেনানীদের সঙ্গে যুদ্ধে আর পেরে ওঠা সম্ভব নয়। পাকিস্তানী সেনারা বাংলাদেশের

সেসব সশস্ত্র যোদ্ধাদের 'মুক্তি' নামের এক ধরণের তাচ্ছিল্যের খেতাবে অভিহিত করেছিল; কিন্তু শুধু তারাই তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলো না, এদেশের প্রায় সকল মানুষ, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-কিশোর, ধর্ম-নির্বিশেষ বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যাই ছিলো মুক্তিযোদ্ধা। সেই ডিসেম্বরে।

অবশ্যই ভুলে যাচ্ছি না, সেইসব বিশ্বাসঘাতক, অবিবেচক, লোভী, নিষ্ঠুর এবং পাকিস্তানী তোষামোদকারীদের কথা। তাদের তো আমরা আর বাঙালি বলে স্বীকার করতাম না। তারা নিজেরাও নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছিল আর এক অভিধা – রাজাকার। তাদেরও আবার সশস্ত্র শাখা ছিল, সেইসব নরাধম ছিল আল-বদর আল শামস বাহিনীভুক্ত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেই ডিসেম্বরে বাতাসে লেগেছিল মুক্তির অবিনাশী ঘ্রাণ।

মনে পড়ে যায়, সে অবশ্য একাত্তরের জুন-জুলাই-এর কথা, ডিসেম্বরের নয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে প্রচার করা হয়েছিল কয়েকটি ঐতিহাসিক পোস্টার। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মুখমণ্ডলে ইস্পাততুল্য দৃঢ়তা আর হাতে রাইফেল এবং পোস্টারে লেখা ছিলো, বাংলার মায়েরা, বাংলার মেয়েরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। অনুরূপ আর একটি পোস্টারে লেখা ছিল, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার হিন্দু, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি। এই প্রচারপত্রের 'বাঙালি' শব্দটিকে অত্যন্ত অর্থবহভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, জাতির এই সংকট ও সংগ্রামের কালে আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষ কী গভীর আত্মিক ও বাস্তব অর্থে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু সহজেই এই 'বাঙালি' শব্দটির জায়গায় 'মুক্তিযোদ্ধা' কথাটি ব্যবহার করা যায়।

সমগ্র জাতিই তো মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছেন বঙ্গবন্ধুর ওই ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ও আগুন-ঝরানো ভাষণের পর। পাকিস্তানীদের অত্যাচার নিপীড়ন যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, বাঙালির মুক্তির ও আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষাও ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ডিসেম্বরে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মধ্যে প্রায় এক কোটি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, আমাদের তরুণরা ওই দেশে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। সেই ডিসেম্বরে আমরা জেনে গেছি, পাকিস্তানীরা লাখ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে, লাখ লাখ জনপদে আগুন দিয়েছে, আমাদের লাখো বাঙালি নারীকে ধর্ষণ করেছে।

এই বর্বরতা, লাখো আত্মীয়স্বজনকে হারানোর বেদনা, লোকালয়ের পরিকল্পিত ধ্বংস কিন্তু দেশবাসীর নৈকট্য ও ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করেছিল। যদি আগে কোন বিভেদ ও দূরত্ব থেকেও থাকে, আঞ্চলিকতার, ধর্মানুগত্যের, রাজনৈতিক মতবাদের, সেসব উধাও হয়ে গিয়েছিল একাত্তরের ডিসেম্বরে। প্রকৃতপক্ষে, তার আগে থেকেই। তবে ডিসেম্বরের শুরু থেকেই সচেতন অধিকাংশ মানুষই অনুমান করতে পেরেছিল, আমাদের বিজয় আর বেশি দূরে নয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতিবাচক অভিমত সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

বিশ্ব গণমাধ্যমে যেভাবে পাকিস্তানীদের বর্বরতা এবং একদিকে শরণার্থী শিবিরে বাঙালির দুঃসহ জীবনযাপন এবং অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে কখনো মুখোমুখি কখনোবা গেরিলা কৌশলের যুদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হচ্ছিল। তার মাধ্যমে আমাদের বিজয় নিশান উড়ানোর ক্ষণ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে ওঠার সঙ্গত ও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ডিসেম্বরে যখন মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তির সম্পূরক হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশের মিত্রবাহিনী যৌথ অভিযানের নীল নকশা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করছিল, বাঙালির চেতনায় তখন নতুন প্রত্যয়, হৃদয়ে এক নির্ভয় প্রত্যাশা।

সেই ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই অথবা নভেম্বরের মধ্যেই ভারত সরকারের ওপর অভ্যন্তরীণ জনমতের চাপ বাড়ছিল, তারা চাইছিল ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করুক। সেই অভিমত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সংবাদপত্রের পাতায়, কোলকাতায় প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে, অসংখ্য শরণার্থী শিবিরের শীতার্ত আবহে। কিন্তু ওই প্রত্যাশার পূরণ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটল না।

তবে ভারতীয় কূটনীতির ভিন্নতর এক চালে ডিসেম্বরের ছয় তারিখে ছোট্ট দেশ ভূটান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি জানাল। তাতেও উচ্ছ্বাসের কমতি ছিল না, কিন্তু ভারতের স্বীকৃতির বিলম্ব হবার জন্য মানুষ তখন অন্যরকম এক উত্তেজনায় যেন ছটফট করছে। দেশের ভেতরে পাকিস্তানী সেনারা তাদের অনিবার্য বিপদ ও পরাজয় যে ঘটবেই, তা বুঝতে পারছে। তাই তখন তারা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তখনও হরিদাসীর শাঁখা ভাঙছে ওইসব বর্বরদের পাশবিক অত্যাচারে, তখনও নদীর তীর

ঘেঁষে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো মানুষের ওপর ব্রাশ ফায়ারের নির্মম মুদ্রায় হত্যাযজ্ঞ চলছে। আবার বিপরীত দিক থেকে পাকিস্তানী সেনারাও নিজেদের জীবনের ঝুঁকি অনুমান করে ধীরে ধীরে দূরবর্তী বা সীমান্তবর্তী এলাকা ছেড়ে ঢাকার দিকে পলায়ন করার কৌশল রচনা করছে। তাদের সেই পরিকল্পনায় বাদ সাধছেন আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ।

তাই সেই ডিসেম্বরের একেবারে প্রথমেই একদিকে মিত্রবাহিনীর মিলিত আক্রমণের চাপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের জন্য আকাশে জমে থাকা সামান্য মেঘও সরে যেতে শুরু করেছে, অন্যদিকে ভারতের মেঘালয় সীমান্তবর্তী হালুয়াঘাট অঞ্চলের যেসব সাধারণ মানুষ আজীবন শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে বিহঙ্গের বর্ণিল ওড়াওড়ি দেখেছে, দেখেছে মেঘের কানাকানি, সেই তারা অবাক হয়ে দেখল, বিচিত্র ও ধূসর রঙের একটা লম্বাটে খাঁচার মত কীসব যেন আকাশ থেকে নেমে আসছে। এইসব গ্রামবাসী হয়ত কোনদিন প্যারাসুট বাহিনী বা ছত্রীসেনার কথা শোনেওনি। সেই ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই স্বাভাবিক কারণেই বাংলার আকাশই আগে শকুনমুক্ত হয়েছিল।

ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আকাশ থেকে হাজার হাজার সাদা কাগজ উড়ছে, পড়ছে সর্বত্র, দেশের নানান জায়গায় অবস্থিত ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরকারি অফিস, বিদ্যালয়ের মাঠ, পাল তোলা নৌকায়, রিক্সা-আরোহীর কোলে, মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানায়। পাকিস্তানী বাহিনীকে সতর্ক করে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে ওইসব প্রচারপত্রে, ইংরেজি ও উর্দূ ভাষায় লেখা ওই আহ্বান ছিল আসলে পাকিস্তানী সেনাদের কাছে পাঠানো চরমপত্র। লণ্ডনের বিবিসি, ভারতের আকাশবাণী ও আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে এই সংবাদটা বিদ্যুতের গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের সর্বত্র। ওইসব বেতারতরঙ্গের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, উত্তরের ঠাকুরগাঁও মুক্ত হয়ে গেছে, দক্ষিণের বরগুনা থেকে পালিয়েছে পাকবাহিনী, প্রবীণ মাঝির বৈঠার প্রহারে অথবা তরুণী গৃহিনীর ঝাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে পাকসেনাদের দোসর সব রাজাকার আর শান্তিবাহিনীর সদস্যরা। যশোর ক্যান্টেনমেন্ট পরিত্যাগ করে পাকসেনারা খুলনায় দিকে চলে যাচ্ছে, সীমান্তবর্তী এসব অঞ্চলও মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সেই ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে প্রতিটি দিনের প্রতিটি প্রহর নতুন নতুন সংবাদ এবং নতুন নতুন প্রত্যাশার জন্ম দিচ্ছে। যে আকুল প্রার্থনায় কোন এক মুক্তিযোদ্ধার মা প্রতিদিন ফজর থেকে এশা পর্যন্ত আকাশ পানে দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে এই কথা নিবেদন করেছেন যে, তার সন্তান যেন ফিরে আসে, যে বালক দেখেছে কীভাবে তার পিতাকে রাজাকার বাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে, অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখে তারা দেখছে সুতীব্র গর্জনে দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে আসছে বিজয়ের ধ্বনি।

যুদ্ধের সমাপন সংকেত শোনা যাচ্ছে এবং কোন কোন প্রান্তরে তাই তার তীব্রতাও বেশি। আমরা কেউই যুদ্ধ চাইনি, আমরা বরং নদীতীরে, বটগাছের নিচে, শস্যক্ষেতে একক বা সম্মেলক গান গাইতে চেয়েছিলাম, লালনের গান, হাছন রাজার গান, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গান, বাউল, ভাটিয়ালি অথবা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সপ্রাণ গান। একটা যুদ্ধের ময়দানে আমাদের অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, একাত্তর সালের মার্চের শেষ থেকে সারা বাংলাদেশই যেন যুদ্ধের ময়দান। অস্ত্রের ভাষা আমরা বুঝতাম না, বুঝতে চাইনি। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিল আমাদের অনিবার্য নিয়তি। ওই যে আমাদের মহানায়ক আহ্বান জানালেন, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলতে হবে, যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে শত্রুর বিপক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাঁর সেই আহ্বান যে এমন অমোঘ হয়ে উঠবে, কে জানত? হয়ত তিনিও জানতেন না। সেই ডিসেম্বরে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন না। এমন একটা বাক্যকে একেবারেই অসত্য মনে হয়। রণাঙ্গনে অথবা দেশের অভ্যন্তরে তিনি হয়ত ছিলেন না, কিন্তু আমাদের চেতনায়, আকাঙ্ক্ষায়, শত্রুকে পরাজিত করার পরিকল্পনায় তিনি সর্বদাই ছিলেন। এই ডিসেম্বরেও তিনি আমাদের সঙ্গে নেই। ইতিহাসের অতীব নিষ্ঠুর পরিহাসের প্রতিফলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হবার পর মাত্র তিন ডিসেম্বরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৭৫ সালের এক বর্বর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন মধ্য আগস্টে।

এই ডিসেম্বর নিয়ে ভাবি, যখন ভাবি এত লাখ লাখ মানুষের আত্মবলিদানের মাধ্যমে যে বিজয় অর্জিত হয়েছিল, তার আড়ালে আমাদের যেসব আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশা অদৃশ্য কিন্তু জাগরুক ছিল, এই চার দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে সেসব যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। সমৃদ্ধির বিভিন্ন হিসেব নিকেশ দিয়ে থাকেন রাজনীতিবিদরা, অর্থনীতিবিদরা। তার মধ্যে হয়ত মিথ্যে নেই। কিন্তু সেই ডিসেম্বরের যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় অনুপ্রেরণা তার কোন চিহ্ন যে আর শনাক্ত করা যায় না।

বঙ্গবন্ধু যে রাজনীতিকে মাটির মানুষের কাছাকাছি আনতে চেয়েছিলেন, আজ তা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর প্রায় সংরক্ষিত সম্পত্তি হয়ে উঠেছে। রাজনীতির পথটা রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। জনমানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন সফল ও প্রতিপত্তিশালী পেশাজীবী, আমলা ও সামরিক কর্মকর্তারা এখন দেশের আপামর জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। মানুষ এখন রাজনীতিকদের ঘোরাফেরা দেখলে সন্ত্রস্ত বোধ করে, আবার রাজনীতিকরাও জনগণকে ভয় পায়, তারা সাধারণভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। এমনিতে তো তাদের নামী-দামী ব্র্যাণ্ডের গাড়ি না চড়লে নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়, তার পরেও তারা নিজেদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, দেহরক্ষী ছাড়া তারা এখানে ওখানে যাতায়াতে নিরাপদ বোধ করেন না। রাজনীতিবিদ, যারা প্রকৃতপক্ষে দেশের/সমাজের পথরেখা অঙ্কন করবেন, তাদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম নিরাপদ দেয়ালের পেছনে সংঘটিত হবার

কারণে, ১৯৭১ সালের মধ্য-ডিসেম্বরে পাওয়া বিজয় তার অর্থ হারিয়ে ফেলছে।

যারা এখন দেশের ভার স্কন্ধে নিয়ে নানা সাফল্যের তালিকা প্রদর্শন করে বেড়ান উচ্চস্বরে এবং যারা আবার এদের বিদায় দিয়ে দেশের মানুষের সত্যিকার মুক্তি বাস্তবায়নের কর্মসূচি প্রণয়নে কোনভাবেই আর বিলম্ব সইতে পারছেন না, তারা জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর সর্বদাই দেশসেবার জন্য উন্মুখ। শুধু এদের কারো অন্তর্জগতেই সেই ডিসেম্বরের ক্রন্দন, হাহাকার এবং তার প্রতিকারের আন্তরিক আর্তি প্রতিধ্বনিত হয় না।

এমন সময়, ডিসেম্বরের উল্লাস আর কান্নার সম্মিলিত আবহে আমরা আলাদা করে যেন মাঝরাতে কুকুরের কান্নার সঙ্গে তুলনীয় বিপদের দূরবর্তী সংকেত শুনে আতঙ্কগ্রস্ত বোধ করছি। যেসব হায়েনা, সেই ডিসেম্বরের বিজয় সংকেত শুনে তড়িঘড়ি করে দেশের সব অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল, আজ এই চার দশক অতিক্রান্ত হবার পর তারা পুনরায় তাদের বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছে। কয়েক বছর আগে এই শকুনের গোষ্ঠী স্পষ্টভাষী লেখক হুমায়ুন আজাদের ওপর প্রায় মারণিক আঘাত হেনেছিল। তারও আগে এরাই কবি শামসুর রহমানকে আক্রমণ করতে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল। এই দু'জনের ওপর হামলার সঙ্গে হয়ত সময়ের দিক থেকে নির্দিষ্টভাবে ডিসেম্বরের কোন যোগ নেই। কিন্তু এই ডিসেম্বরে সেসব কথা আলাদাভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে।

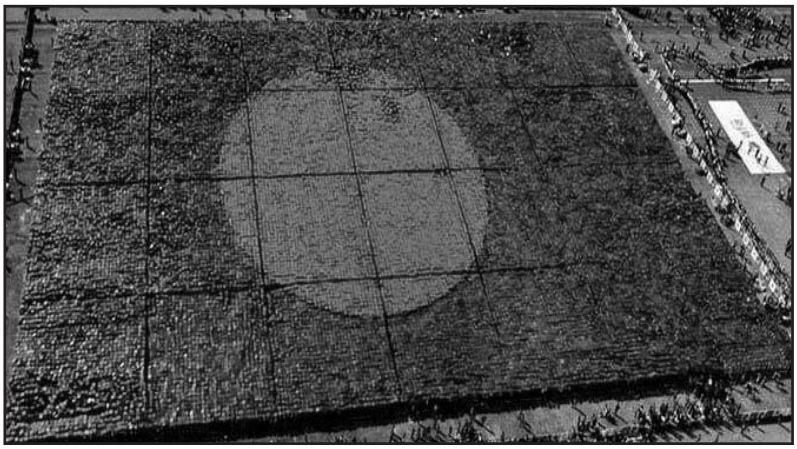

বিজয় অর্জনের পর বছর তিনেকের বিরতি ছাড়া দেশের স্বাধীনতার বিরোধী এই চক্র প্রায় সব সময়ই নানা তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। ধীরে ধীরে শক্তি অর্জনের একটা পরিকল্পনা নিয়ে তারা তাদের কর্মসূচি রচনা করেছে। ধীরে ধীরেই কিন্তু বিরতিহীনভাবে তারা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের নানা প্রান্তে। কিন্তু যদি আলাদা করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি এই ডিসেম্বরে তাদের ব্যাপক ও নির্বিকার বর্বরতার কথা, যেভাবে মুক্তিকামী মানুষের চেতনার ওপর তারা আঘাত করছে, তাতে মনে হয় একাত্তরের সেই ডিসেম্বরে আমাদের বিজয় কোন গল্পকাহিনী, কল্পকথা। অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার এই ডিসেম্বরে তো আমরা সেই লাখো শহীদকে স্মরণ করছি। ইতিহাস থেকে ছেঁকে নিয়ে আসা কত মর্মন্তুদ ছবির ফুটেজ দেখছি প্রতিদিন, প্রায় প্রত্যেক টিভি চ্যানেলে।

সেই ডিসেম্বরে আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল দেশের সাধারণ মানুষকে যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষার বৃত্তে আনব। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই কাজে আমরা বেশ দৃশ্যমান সফলতা অর্জন করেছি। এই ডিসেম্বরে আমাদের শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না, তাদের পথ আগলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের আধুনিক সশস্ত্র ক্যাডাররা, ককটেল নিক্ষেপে প্রশিক্ষিত তরুণ, যাঁরা স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের আদর্শিক বা ভাড়াটে সদস্য। তারা বোমা মেরে সেই ডিসেম্বরে ধ্বংস করেছিল কত শত বিদ্যালয়, এবার বোমার আঘাতে তারা ক্ষত-বিক্ষত করছে আমাদের শিশুশিক্ষার্থীদের। পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সঙ্গেও তাদের স্কুলে আসার উপায় নেই। তারা রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছে, গণপরিবহনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, রিক্সা আরোহীর ওপর হামলা করছে। এই ডিসেম্বরে এমন সহিংসতার সাক্ষী এইসব সাধারণ শিক্ষার্থী দিনে-রাতে নিজের বাড়িতে বসেও সন্ত্রস্ত বোধ করছে।

টেলিভিশনের পর্দায় বিয়াল্লিশ বছর আগে-পরের ছবিগুলো যেন শুধু সাদা-কালো এবং রঙিন এমনভাবেই আলাদা করে শনাক্ত করে নেয় তারা। সেটা বাদ দিলে তারা দেখছে ডিসেম্বরের দৃশ্য, আগুন, ধোঁয়া, আতঙ্কে মানুষের ছোটাছুটি। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার যে ধারণার সঙ্গে মানুষ পরিচিত, যেখানে কোন মানুষ স্বেচ্ছায় ঘুরে বেড়াতে পারে, জীবনের চাহিদা পূরণে নানা জায়গায় যাতায়াত করতে পারে, একাত্তরের ডিসেম্বরের প্রথম অর্ধে প্রায় সারাদেশের সর্বত্র তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। ঠিক সেদিনের তুলনায় সর্বসাধারণের জীবনের বিপন্নতার দৃষ্টান্ত এই ডিসেম্বরে দেখা না গেলেও তার আঁচ ভালভাবেই স্পর্শ করছে আমাদের। আর সবচেয়ে বড় কথা, সেদিন একাত্তরে যেসব পশুতুল্য স্বাধীনতাবিরোধী মানুষ আমাদের জীবনকে শঙ্কাময় করে তুলেছিল, আজও ঠিক তাদের আদর্শিক উত্তরাধিকারীরা সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। তাদের হুঙ্কারের শব্দ অবিকল ওই একাত্তরের মত।

এই ডিসেম্বরের পরিস্থিতি একদিক থেকে তার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর। সেদিন মুক্তিযুদ্ধের ওই রক্তাক্ত ও পরম অনিশ্চিত দিনযাপনের অভিজ্ঞতায় আমাদের পরম সম্পদ ছিল আমাদের ইস্পাতকঠিন জাতীয় ঐক্য। সেইজন্যই নয় মাসের মধ্যে আমরা এমন কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম, যার ফলে ওই ডিসেম্বরের মধ্যভাগে বীরদর্পী পাকিস্তানী বাহিনীকে আমরা 'সামরিকভাবেই' পরাস্ত করতে পেরেছিলাম। আমরা সবাই সেদিন স্বাধীনতার পক্ষে ছিলাম, দেশের পক্ষে ছিলাম, সমগ্র

বাঙালি জাতির মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষার দুর্দমনীয় অংশীদার ছিলাম। কিন্তু এই ডিসেম্বরে যখন স্বাধীনতাবিরোধীদের উদ্ধত তৎপরতায় আমাদের জনজীবন বিপর্যস্ত, আমরা যেন সেদিনের সম্মিলিত সাহসের জায়গা থেকে সরে সরে যাচ্ছি, সেদিন যে সম্মিলনী শক্তিতে প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিরোধের সংকল্প তৈরি হয়েছিল, এই ডিসেম্বরে তার কোন লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

আগ্রাসী গোষ্ঠী তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে নানাভাবে, নানা নামের ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের বিস্তার ঘটিয়েছে তারা, শহরে-গ্রামে প্রকাশ্যে ধর্মীয় শিক্ষার হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে জঙ্গিবাদের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে, আবার সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে। এরা বাংলাদেশের উদারবাদী অসম্প্রদায়িক, সহিষ্ণু সমাজ-সম্পর্ক ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চায়। এই ডিসেম্বরে তাদের ত্রাসের প্রদর্শনী অনেক বেশি দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে, তাদের হিংসার বলি হিসেবে দেশের হেথায়-হোথায় মানুষের শরীর লাশ হয়ে যাচ্ছে, একাত্তরের অনুসরণে এইসব মানুষকে আর শহীদ বলছি না, কারণ এরা তো কোন প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি; করার উপায়ও নেই, কারণ, এরা যে অনেকেই সাধারণ মানুষ। বর্তমানের বিশেষ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এইসব স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে হয়তো উসকে দিয়েছে। একথা মানলেও ওই অনস্বীকার্য সত্যটা তো থেকেই যায় যে, এ শক্তির অস্তিত্ব আমাদের সমাজের মধ্যেই রয়ে গেছে, শীতকালে সাপ যেমন নিজেকে লুকিয়ে রাখে, অনুকূল পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করে, তারপর ফণা তুলে, দংশন করে জানিয়ে দেয় তার বিষের মাত্রা, এরাও ঠিক তেমন।

দুই ভিন্ন ডিসেম্বরের এই সাদৃশ্যের বিষয়টাতে দুই বিপরীত বিন্দু থেকেও দেখা যায়। সেই একাত্তরে আমাদের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর চলাচলে অবরোধ সৃষ্টির জন্য মহাসড়কের সেতু ধ্বংস করে দিত, রেললাইন উপড়ে ফেলত, রাস্তা কেটে রাখত যাতে অত্যাচারীরা জনপদে পৌঁছাতে না পারে, মুক্তিসেনাদের আস্তানার খোঁজ না পায়। আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের যে কৌশলে তারা বারে বারে পর্যুদস্ত হয়েছিল এবং অবশেষে ডিসেম্বরের ষোল তারিখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

এবার যেন সেই পরাজিত গোষ্ঠীর এই কালের অনুসারীরা একই কৌশলে ডিসেম্বর মাসে সারা দেশের মানুষের বিজয় দিবসের চেতনাকে আহত করার জন্য রেলপথে বিভিন্ন রকমের নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়েছে। জাতীয় সম্পদের ক্ষতি করে রাস্তায় গর্ত খুঁড়ে রাখছে, পরিবেশের ওপর নির্মম আঘাত হেনে হাজার হাজার বৃক্ষনিধন করছে, গরীব কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় বাধা দিচ্ছে। আজ যারা দেশ রক্ষায় নিয়োজিত, একাত্তরে ডিসেম্বরের বিজয়ের সূত্রে যারা এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছে, তারাই এখন জঙ্গীবাদীদের প্রধান টার্গেট। সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করতে এরা দ্বিধা বোধ করছে না। কী করুণভাবে দুই ডিসেম্বর মিলিত হয়ে যায়।

একাত্তরের ডিসেম্বর অথবা মার্চ মাসের শেষ থেকে মধ্য-ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকার আল বদর বাহিনীর আর এক সুনির্দিষ্ট টার্গেট ছিল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, বিশেষত হিন্দু জনসংখ্যা। এবারের ডিসেম্বরেও দেখেছি, তারই পুনরাবৃত্তি। একাত্তরের মার্চের শেষেই আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্চার ব্লাড ওয়াশিংটনে তার বার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে selective genocide চলছে, স্পষ্টতই তিনি ওই তারবার্তায় selective বলতে হিন্দুদের বুঝিয়েছিলেন। আজও, এই ডিসেম্বরে এই বিজয়ের মাসে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ হিন্দুগোষ্ঠীর ওপর পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে, তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেয়া হচ্ছে, হামলাকারীরা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, মন্দিরের প্রতিমা ধুলিসাৎ করছে। ওই ডিসেম্বরে যে ঘৃণার ভাষায় পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসররা হিন্দুদের নিয়ে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলতো, এখন দেখা যাচ্ছে ঠিক সেই একইভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিগৃহীত হচ্ছে। আজ তাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই। জাতীয় ঐক্যের ধারণাটা এমনভাবে বিকৃত হয়েছে যে, আজ যেন তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। কিন্তু এই ডিসেম্বরে এই অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে না পারি, তাহলে শুধু হিন্দু নয়, দেশের উদারপন্থী প্রগতিবাদী স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী সকলেই বিপন্নতার মুখোমুখি হব।

এসব কথা ভাবতে বা লিখতে গিয়ে হৃদয়ের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়। শ্বাপদের আনাগোনার শব্দ শুধু বর্তমানকে নয় আমাদের আগামী দিনগুলির সংকট চিন্তায় আমাদের ভয়ার্ত করে তোলে। তবে একথাও তো সত্য যে, সব মেঘের আড়ালেই থাকে সূর্যের হাসি। এই ডিসেম্বরের এই মুহুর্মুহু ককটেল বিস্ফোরণ ও জনপদে পাকিস্তানী প্রেতাত্মাদের নিত্যহানার মধ্যেও আমরা তো দেখেছি ষোল তারিখে ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা ও বিজয় অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কী উন্মাদনা! বিজয়ের উত্তরাধিকারকে যারা নিরাপদ রাখবে সেই তরুণরা ঢাকা রেসকোর্সের সেই ঐতিহাসিক আত্মসর্মপণের দলিল স্বাক্ষরের স্থানের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একটা জায়গার নামই পাল্টে দিল, শাহবাগ হয়ে গেল প্রজন্ম চত্বর, গণজাগরণের উদ্দীপ্ত শ্লোগান লাখো কণ্ঠে। এবারের ডিসেম্বরে আমাদের হাজার হাজার কিশোর কিশোরী ও সেনা সদস্য গড়ে তুলল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মানব পতাকা। সে কী অপরূপ দৃশ্য। আর রেসকোর্সের ওই বিশেষ স্থান ঘিরে সমবেত হয়েছিল আক্ষরিক অর্থেই লাখো মানুষ, পাকিস্তানীদের হার মানার সুনির্দিষ্ট লগ্নে সবাই প্রাণের গহীন থেকে অনুভবকে কণ্ঠস্বরে ধারণ করে গাইল, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' দেশবাসীর এই সম্মিলিত শপথ বৃথা যেতে পারে না।

শর্বরী আলোময়ী
শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী

শা ও য়া ল খা ন

রোকেয়ার স্বপ্ন বনাম বিজ্ঞাপনে নারী

বেগম রোকেয়াকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছুই নেই। তিনি আপন মহিমায় উজ্জ্বল, দীপ্যমান। নেই তাঁর স্বপ্নও অজানা আজ কারও। তিনি জন্মেছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশের সময়কালে ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। ব্রিটিশ রাজের উপনিবেশ মানেই ছিল শাসন-শোষণের বেড়াজাল। সেই বেড়াজালের মধ্যেই নারীজগৎ বা নারী বলয় ছিল উপনিবেশে বিদ্যমান উপ-উপনিবেশ। অর্থাৎ উপনিবেশের শাসন শোষণের মধ্যে উপ-উপনিবেশের খড়ক। এই খড়কের শিকার গোটা নারী সমাজ। সামগ্রিক জনসংখ্যার অর্ধেক জনসংখ্যার অধিকার ও চাহিদা বিষয়ে সমাজব্যবস্থা ছিল চরম উদাসীন ও অবমাননাকর। এ ছিল গোটা ভারতবর্ষের উপনিবেশের চেয়ে আরো নির্মম ও নিষ্ঠুর পরিহাস যা রোকেয়া উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মুসলিম পরিবারের, সমাজের পরিমণ্ডল থেকে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ ব্যাধির বিস্তৃতি তিনি সনাক্ত করেছিলেন। এ ব্যাধির প্রতিষেধক কি সেটাও তিনি বাতলে দিয়েছিলেন তাঁর স্বপ্ন, সাধনা ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে 'জাগো ভগিনি গো জাগো'- রোকেয়ার দীপ্ত উচ্চারণ, একক প্রয়াস, শ্রম, সাধনা ও ত্যাগে যে স্বপ্নের বীজ বুনেছিলেন, আধুনিক সমাজতত্ত্বের বিচারে তা ছিল উপনিবেশবাদ বিরোধিতার চেয়ে অনেক বেশি সুদূর প্রসারী এবং তাৎপর্যবহ।

সেই সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের প্রভাব এখন বাঙালি মুসলিম সমাজে পরিলক্ষিত হয়। নারী সমাজ এখন শিক্ষাদীক্ষা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কাজেও নিয়োজিত। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর পদচারণা লক্ষ্য করা গেলেও রোকেয়ার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সেটা কিছুতেই বলা যাবে না। আত্মসম্মানের সাথে সমাজে নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নারীসমাজকে আরো অগ্রগামী হতে হবে। এখানেও আমরা রোকেয়াতে পাই অনবদ্য অনুপ্রেরণা, যেমন স্ত্রী জাতির অবনতি প্রবন্ধে লিখেছেন 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টার, লেডী জজ সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে 'রাণী' করিয়া ফেলিব! উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামীর' গৃহকার্য্যে করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?' একশত বছরেরও বেশি আগে এমন সাহসী উচ্চারণ, এমন উদ্যমী কণ্ঠ কোথায় পেয়েছিলেন তিনি?

একই প্রবন্ধে আরো দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমরা যদি রাজকীয় কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। ...যদি বল, আমরা দুর্ব্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না!

'...আমরা সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে

খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে- একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে- সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। ...আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

'ভরসা করি আমাদের সুযোগ্য ভগ্নীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।' সেই শতাধিক বছর আগের আহ্বান এখনও সমান প্রযোজ্য। কিন্তু কথা হলো আমরা কি আজ পর্যন্ত সেই অর্থে চিন্তা করেছি? সেই 'একটু গভীরভাবে চিন্তা' গভীরভাবে অনুধাবন করা হলে আজকের নারীসমাজের অবস্থান আরো উন্নত হতো।

রোকেয়া তাঁর কাজের পরতে পরতে সত্যিকারের প্রকৃত শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা'র অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য্য করি, চক্ষুদ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল পাশ করা বিদ্যা'কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। প্রকৃত শিক্ষা কি তা বুঝানোর জন্য এর চেয়ে পরিষ্কার কথা কি হতে পারে?

দর্শনশক্তির বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন-'যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দ্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal), কর্দ্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি, পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক! এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনী! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দ্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা মানিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব?''-জ্ঞান অর্জনে যে খোদারও তুষ্টি মেলে সে কথাই বলেছেন রোকেয়া।

রোকেয়া পর্দা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'বোরকা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'অবরোধ প্রথা স্বাভাবিক নহে নৈতিক। কেননা পশুদের মধ্যে এ নিয়ম নাই। মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া অনেক অস্বাভাবিক কাজ করিতে শিখিয়াছে। যথা- পদব্রজে ভ্রমণ করা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের সুবিধার জন্য গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি নানা প্রকার যানবাহন প্রস্তুত করিয়াছে।

'সাঁতার দিয়া জলাশয় পার হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষে নানাবিধ জলযান প্রস্তুত করিয়াছে।– তাহার সাহায্যে সাঁতার না জানিলেও অনায়াসে সমুদ্র পার হওয়া যায়। ঐরূপ মানুষের 'অস্বাভাবিক' সভ্যতার ফলেই অন্তঃপুরের সৃষ্টি।

'পৃথিবীর অসভ্য জাতিরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, পূর্বে অসভ্য ব্রিটেনেরা অর্দ্ধনগ্ন থাকিত। ঐ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থার পূর্বের গায়ে রঙ মাখিত। ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোষাক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।.....পর্দা অর্থে তো আমরা বুঝি গোপন করা বা হওয়া, শরীর ঢাকা ইত্যাদি কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই 'বে-পর্দা' বলি। যাহারা ঘরের ভেতর চাকরদের সম্মুখে অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাহাদের অপেক্ষা যহারা ভালমতে পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।.....ইংরেজী আদব কায়দা (etiquette) ও আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বর রহিত (simple) পোষাক ব্যবহার করিবেন-বিশেষত পদব্রজে ভ্রমণকালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাহাদের উচিত নহে। (ঐ উপদেশ আমরা কোরাণ শরীফের অষ্টাদশ পারার 'সুরা নূরের' একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। যথা-'বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নীচের দিকে রাখে অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ না দেখে।) এবং তাহারা যেন আভরণ (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত) অন্য লোককে না দেখায়'।

একটা প্রবন্ধে বলেছেন, 'কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারের মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাটী যাতায়াত করেন না। ইহাতে পাঁচ রকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একেবারে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকেন।

'অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখা শুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রুপ করা উচিত। অবশ্য যাহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাহাদের সঙ্গে মিশিব,– তাহারা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী (ইহুদী, নাসাবা, বুৎপরস্ত বা যাই) হউন, ক্ষতি নাই। ...আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।'

নারী স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া

স্বাধীনতা হারাইয়াছি।' স্ত্রীজাতির অবনতি প্রবন্ধে অলঙ্কার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্ব্বলতা নহে? এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রোকেয়ার স্বপ্ন অর্থাৎ রোকেয়ার চিন্তা চেতনা, সাধনা ও কর্ম পরিকল্পনা অথবা বিজ্ঞাপনে নারী প্রতীক কতটুকু মর্যাদাবর্ধক? নারী উন্নয়নে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে আমরা দেখতে পাই রোকেয়ার উপস্থিতি। কিন্তু যত্রতত্র বিজ্ঞাপনে নারী প্রতীক কি রোকেয়ার প্রতিনিধিত্ব করে? নারীর মর্যাদাকে যথাযথভাবে ধারণ করে? অথবা তা কি নারী স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ?

সরল উক্তি বিজ্ঞাপন কি এবং কেন? বিজ্ঞাপন এক ধরণের বার্তা, জ্ঞাপন, পণ্য বা বিষয়ে জাহির করা অর্থাৎ বিশেষভাবে জ্ঞাপনের নামই বিজ্ঞাপন। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর এ দুনিয়ায় প্রসার, পসার ও প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম বিজ্ঞাপন। ব্যবসায় বাণিজ্যের এক বিশেষ হাতিয়ার এবং সুপরিকল্পিত বিনিয়োগ অথবা লক্ষ্যের হাতছানি। এমন কি ক্রেতা বিক্রেতার যোগাযোগের সেতুবন্ধন। সব মিলিয়ে নরমে গরমে বিজ্ঞাপনও এক ধরণের খবর। কোথায় কি পাওয়া যায়, কোন জিনিসটার ব্যবহারবিধি কি, কোন জিনিসটার ব্যবহারের বা বিষয়ের উপকারিতা কি, গুণাগুণ কি ইত্যাদি। সোজাসাপটা কথায় বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্য বিজ্ঞাপিত বিষয়কে/বস্তুকে-দর্শক/শ্রোতা/ ব্যবহারকারীর দৃষ্টিগোচরে নিয়ে আসা বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

পরিবেশ, পরিস্থিতি ও আবহভেদে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন হতে পারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দাপ্তরিক, গ্রুপভিত্তিক, ব্যবসায়িক, সরকারি-বেসরকারি, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, পরিবেশগত, একান্ত বা সমষ্টিগত অথবা জাতীয় সুখ-দুঃখের ঘটনা বা বিশেষ কোন স্মরণীয় বরণীয় দিন নিয়ে। মোদ্দা কথা হল, বিজ্ঞাপন এক ধরনের প্রচার। আবার এর জন্য দরকার প্রচারের মাধ্যম। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম অনেক বেশি কার্যকর। আবার বিজ্ঞাপনই গণমাধ্যমের সঞ্জীবনী শক্তি। গণমাধ্যমের যেমন বিজ্ঞাপন না হলে চলে না, বিজ্ঞাপনেরও ঠিক তাই গণমাধ্যম না হলে উদ্দেশ্য সাধন হয় না। অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বিজ্ঞাপন নির্মাণের কলাকৌশল, বিজ্ঞাপনের ব্যবহার, প্রচার এসব বিষয়ে বিস্তর বলার সুযোগ আছে। সেসব আলোচনায় যাচ্ছি না, কারণ সেসব কলাকৌশলীদের বিষয়। বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা আজকাল অপরিহার্য। এই অপহার্যতার কারণে বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রহীতা, বিজ্ঞাপন প্রচারক, প্রকাশক এবং সাধারণ দর্শক-শ্রোতা, সর্বোপরি বিজ্ঞাপন নির্মাতা সবাই জানের বিজ্ঞাপন কি এবং কেন। সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞাপন আজ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়েরই একটি।

বিজ্ঞাপন জনস্বার্থেই হোক বা বাণিজ্যিক প্রসারেই হোক, সব বিজ্ঞাপনেরই সাধারণ একটি অর্থ থাকে, সেইসাথে অন্তর্নিহিত অর্থ সেটা বলতে হয় না বা লিখতে হয় না। থাকে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ। আবার ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাপনের প্রত্যেকটার বিশেষ কিছু নিজস্ব অর্থ থাকে। শুধু জনগণকে অবহিতকরণ বা প্রচারই যদি বিজ্ঞাপনের অর্থ হতো তা হলে ছাপার কালিতে অথবা স্পষ্ট উচ্চারণে বিজ্ঞাপনের ভাষা বিজ্ঞাপিত করলেই হত। কোন ঘোষণা বা বার্তা জনগণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপন নির্মাণ করার প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজন হতো না নামী-দামী প্রতীকের ব্যবহার। প্রয়োজন পড়তো না নামী-দামী তারকা শিল্পীর ছায়া, কায়া ও বুলি ব্যবহারের। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ মার্শাল ম্যাকলুহানের 'মিডিয়া ইজ দ্য মেসেজ' ধারণা থেকে গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য, বরণীয় কাউকে দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু বিজ্ঞাপিত করার মাধ্যমে বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার রেওয়াজ মন্দ কিছু না, কিন্তু সব কিছুর তো একটা সীমা পরিসীমা থাকা চাই। বার্তাটা কে পরিবেশন করছে, কোন মাধ্যম করছে, সমাজের গ্রহণযোগ্য কেউ কিনা, সেটাই ছিল একসময় বিবেচ্য বিষয়। আর এখন বিজ্ঞাপন মানে বিশেষ করে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন মানেই নারী প্রতীক। যত্রতত্র অনাকাঙ্ক্ষিত অবয়বে নারী প্রতীকের ব্যবহার শুধু নারীর মর্যাদাই ক্ষুন্ন করছে না, বিজ্ঞাপনের মানও বিঘ্নিত করছে। বিজ্ঞাপন বাণিজ্যে সামাজিক মূল্যবোধকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ব্যবহৃত নারী প্রতীক হয়তো আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে নারী সমাজকে কদর্যভাবেই উপস্থাপন করা হচ্ছে। নারীকে দেখানো হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের সমতুল্য করে, কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও নস্যি। বিজ্ঞাপনের ভাষ্য মতে ভালো রাঁধুনী না হলে, ক্রীমের জোরে গায়ের ছাল ছিলে ফর্সা না হলে পৃথিবীর এ কর্মমুখর মানবজগতে নারীর জীবন যেন অর্থহীন।

সামাজিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে আধুনিকতার ঢালে বিশ্ববাণিজ্যের দৌরাত্ম্যে নারী কিভাবে ভোগ্যপণ্যেরমত উপস্থাপিত হচ্ছে, ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে তা কোন গণমাধ্যমের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হবে। এই আধুনিকতার যুগে, গৌরবময়, প্রযুক্তির যুগেও পুঁজির দাপটে নারীকে চামড়া ছিলে/ঘসে/ঘসে মেজে ফর্সা বানিয়ে ছাড়ছে। ফর্সা হওয়াই নাকি সৌন্দর্য বিকাশের প্রথমিক সোপান। এক শ্রেণীর মেয়েদের দেখা যায় মেধাবিকাশের জন্যে যতটুকু সময় ব্যয় করে, তার চেয়ে বেশি সময়ও অর্থ ব্যয় করে সৌন্দর্যের বাজার সৃষ্টিতে। কারণ সমগ্র বিশ্বে নারীর সৌন্দর্যের বাজার বেড়েই চলছে। আর সৌন্দর্য

বাজারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সেই নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নারী ব্যবহৃত হচ্ছে। দিন দিন পণ্য হয়ে উঠছে। নারীর রূপ, অঙ্গসজ্জা প্রদর্শনের জন্য নিত্যনতুন কৌশল বাজারজাত করা হচ্ছে, বিকানো হচ্ছে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগানোর নানা তকমা। জাগানো হচ্ছে লোভনীয় স্বপ্ন। তুলে ধরা হচ্ছে মোহনীয় রূপালী জগতের ঝকঝকে হাতছানি। কারণ সেখানে অর্থ, খ্যাতি ও প্রাচুর্য্য মেলে সহজে, রাতারাতি মেলে তারকাখ্যাতি, হয়ে যাওয়া যায় সেলিব্রেটি। এসব মননে ধারণ করে, মোহগ্রস্ত বহু নারীর (বিশেষ করে উঠতি বয়সের) জীবন-ভাবনায় এখন রূপালী জগতের বর্ণিল নেশা ঘুরপাক খাচ্ছে। একজন উঠতি বয়সের মেয়ে যখন এমন ঘুরপাকের আবর্তে, তখন ফেয়ারনেস ক্রিমের চটকদার উপস্থাপনা, টিভি স্ক্রিন বা সেটে ভেসে উঠা রূপসী নারীর লাস্যময় ভঙ্গি, মোহনীয় হাসি তাকে সহজেই আকৃষ্ট করে। ফেয়ারনেস ক্রিম ঘসাই জীবন গড়ার হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। সমাজে উঠতি বয়সের মেয়েরাই এ তালিম নিচ্ছে, এ দাওয়াই গিলছে। ফলে, তাদের আত্মবিশ্বাসে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও গঠন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নূর কামরুন নাহার এর প্রবন্ধ নারীর সৌন্দর্য বাজারঃ মেয়েরা কি পিছিয়ে যাচ্ছে (যোগাযোগ-বর্ষপূর্তি সংখ্যা ২০১৩-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন)-এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, 'জোর হাজার ফ্যাশন শো, নানা নামের, নানা ঢংয়ের অসংখ্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন আবার প্রকারান্তে নারীর শরীর ও বিভিন্ন অঙ্গের প্রদর্শন। এই সব নানা গালভরা নাম আর আয়োজনে নারীর শরীর প্রদর্শনকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে এটা নারীর জন্য চ্যালেঞ্জিং পেশা। আর এসব চ্যালেঞ্জ গ্রহণে নারীরা কোনভাবেই এখন আর অসম্মানিত বোধ করেন না। তাই কত বেশি করে শরীর দেখিয়ে কতভাবে নিজেকে পণ্য করে এ বাজার ধরে রাখা যায় এবং এ সৌন্দর্য বাজারে টিকে থাকা যায় তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে নারী। আর সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেকে অন্তঃসারশূন্য করে উন্মুক্ত করছে নগ্নতা। নগ্নতা এবং শরীর প্রদর্শন এখন অত্যন্ত গর্বের বিষয়, একই সাথে সাহসিকতার পরিচায়ক। আর আমরা যারা এই সৌন্দর্য বাজারের ভোক্তা, তাদের কাছে এটাই উপভোগ্য আর নগ্নতাই স্বাভাবিক বিষয়। এছাড়া আমরা জানি ক্যারিয়ার গঠনে এমন কিছু খোলামেলা ব্যাপার থাকবে এবং এমন কিছু প্রকাশ্য গোপনীয়তা থাকবে যেখানে নারীকে এভাবেই ব্যবহার করা হবে। আর নারীও জানে ক্যারিয়ার গঠনের জন্য তাকে কিছু ছাড় দিতে হবে, আর সেটা শরীর ও সৌন্দর্য 'সেটাই হাতিয়ার'।

'মূলত সমাজ নারীকে পণ্য ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে অভ্যস্ত নয়। এবং নারীর মধ্যে তা সেভাবেই প্রোথিত। নারী তাই এই সৌন্দর্য বাজারের জালকে অনুধাবনও করতে পারে না। তাই নারীর জন্য সৌন্দর্যের বাজার যত প্রসারিত অন্য বাজার ততটাই সংকুচিত। রূপ বিক্রির ক্যারিয়ারে নারীকে যেমন উৎসাহিত করা হয়, মেধার এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে ততটা উৎসাহিত করা হয় না। রূপের বাজারে নারীর প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে প্রাপ্তি যেমন লোভনীয়, মেধা এবং জ্ঞানের চর্চায় তা এত সহজ ও লাভজনক নয়। তাই নারীকে রূপের বাজার সহজেই আকর্ষণ করে, অনেক মেধাবী নারীও ক্যারিয়ার গঠনে রূপের বাজারে ছুটে। রূপের বাজারে নারীর এ কদর এবং নারীর সৌন্দর্যকে বিশেষ প্রাধান্য প্রদান নারীকে অন্তঃসারশূন্য করে তোলার এক সূক্ষ্ম কৌশল।'

নূর কামরুন নাহার বিষয়টা যথাযথ ভাবেই তুলে ধরেছেন। পেশা নির্বাচনে মেয়েদের দেখে শুনে আত্মমর্যাদার কথা ভেবে এগুতে হবে। কারণ মেয়েরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণে সক্ষম হয়েছে। নারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রপরিচালনা, ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতার সাক্ষর রেখে চলছে। নারী এখন শুধু গৃহসজ্জা তথা বিনোদনের ক্রীড়নকমাত্র নয়। একথা নারীকে অন্য কেউ এসে মনে করিয়ে দিবে না। শিক্ষা দীক্ষায় যেমন নারী এগিয়ে চলছে তেমনি নিজের যোগ্যতায় দক্ষতায় নারীকে সমাজের গঠনমূলক কর্মক্ষেত্রে জায়গা করে নিতে হবে। বিনোদন আমরাও করব কিন্তু সেটা নিশ্চয় শালীনতা বজায় রেখে। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা যদি বাছ-বিচারহীন চটকদার বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে একবার ভুল পথে পা বাড়ায়, নিজেদেরকে ভুল পথে চালিত করে, তাহলে নিজেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা খুব কিন্তু সহজ না। বরং তাদের ভবিষ্যৎ হুমকির সম্মুখীন হতে বাধ্য।

টেলিভিশনের পর্দায় অথবা ইন্টারনেটের পর্দায় চোখ রাখলে অবলীলায় দেখতে পাবেন চটকদার অনেক বিজ্ঞাপন। যেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক তরুণ-তরুণী। ওরা হাঁটতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, খেতে, ঘুমাতে, কাজ করতে এমনকি সব কিছুতেই কোন না কোন বিষয়কে বিজ্ঞাপিত করছে। দেখে মনে হয় দুনিয়া বড়ই বর্ণিল, বড়ই সচল। কিন্তু বাস্তব জগতের সাথে এসবের মিল কতটুকু তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কোমল পানীয় কি উত্তেজক কিছু? দেখা যায় কোমল পানীয়ের উত্তেজনায় ব্যবহৃত প্রতীকরা টিভি/ নেটের পর্দা ভেঙ্গে ফেলতে চায়। মোবাইল নেটওয়ার্ক/সেটের কথা কি আর বলবো। এসব বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত প্রতীকের আচরণ প্রকৃতি গতিবিধির মধ্যে স্বাভাবিকতা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। এই কি আমাদের বাণিজ্যের প্রকৃতি? এই কি আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ? আমাদের সংস্কৃতি? এটা কোন ধরনের সংস্কৃতি? অনেকেই বলেন এটা নাকি মডেল সংস্কৃতি, পণ্য সংস্কৃতি। অনেক রদ্দি জিনিসের চটকদার বিজ্ঞাপনে বাজার এখন সরগরম। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের

অহেতুক ছড়াছড়ি দেখে মনে হয় দুনিয়াটা বুঝি ওসব পণ্যের ছকে আঁকা, ওসব পণ্য ব্যবহারের জন্যেই টিকে আছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি। আবার নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের বিজ্ঞাপন ভাষ্যে গুণাগুণের তালিকায় উপস্থাপিত কলেবর এমনসব চিত্র হাজির করে বা উপহার দেয় তুল্য বিচারে দেখা যায় যেন কুকুরের চেয়ে কুকুরের লেজ অনেক লম্বা। এই লেজই দ্রব্যের ভোক্তা/গ্রাহককে বিভ্রান্ত করে।

ফিরে আসি বিজ্ঞাপনে নারী প্রতীক প্রসঙ্গে। কোন কোন বিজ্ঞাপন চিত্রে নারীকে এমন কদর্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে নারী ফর্সা না হলে, নারীর সাংসারিক, পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক এমনকি ব্যক্তিগত অর্থাৎ পুরো জীবন প্রণালী যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যে গৃহবধূর সারাদিন গৃহস্থালির কাজ করছেন, রান্না করছেন, বাসন মাজছেন, কাপড় ধুচ্ছেন কোন কিছুতেই পরিবারের কেউই তুষ্ট না, কিন্তু সেই গৃহবধূর বিশেষ মশলাযোগে তরকারীর স্বাদে পরিবারের সবাই সন্তুষ্ট হচ্ছে, বিশেষ তেল বা চা পাতা ব্যবহার করে শ্বশুরকুলের মন জয় করছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেয়া এসব সমাজচিত্র শতাধিক বছর আগে আমাদের নারী সমাজকে অগ্রগামী করার বেগম রোকেয়ার সেই সংগ্রামকে বিদ্রূপ করে। রোকেয়া আমাদের মেয়েদের দীনহীন অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বা চিত্র তুলে ধরতে বলেছেন,' রমণী রাঁধুনীরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং মরণে বাবুর্চি -জীবনলীলা সঙ্গ করে।' (রসনা-পূজা-১৯২ রোকেয়া রচনাবলী)।- এইসব বিজ্ঞাপনচিত্র মরণে জীবনলীলা সাঙ্গ করার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করছে তাই নয় কি? সময়ের এই পরিপ্রেক্ষিতে এমনতর প্রচার-প্রচারণা নারীকে এগিয়ে নেয়ার পক্ষে, নারীর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে কতটুকু সহায়ক?

বিশেষ সৌন্দর্য সাবান ব্যবহারে তরুণীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় বিভিন্ন লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় বাণীযোগে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় রমণীর উপস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ সাজ-পোষাকে। অর্থাৎ শ্বশুরের আদরের বৌ-মা বলার জন্যে নির্ভর করতে হয় বিশেষ চায়ের উপর, শ্বশুর বাড়ির সবার মন জয় করার জন্য নির্ভর করতে হয় সুস্বাদু ব্যঞ্জনের ওপর, আবার সমাজ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে ভর করতে হয় বাহ্যিক আকর্ষণের ওপর আর এসব ধরে রাখার জন্যে গিলতে হয় বিজ্ঞাপিত পণ্য ইত্যাদি।

এই হচ্ছে নারীর জীবন গড়া, নারী নিয়ে সমাজ গড়া, নারীকে প্রতিষ্ঠা করা, নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা, এক কথায় পুঁজিবাজরে নারীর বিনিয়োগ। বিজ্ঞাপন আরোপিত এই বিষয়গুলো নারীর সাধারণ স্বাভাবিক জীবন ধারায় ভর করে, নারীর পথ চলায়, অগ্রযাত্রায়, নারীর আত্মসম্মানে নিয়ত আঘাত হানছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মসম্মানসম্পন্ন প্রত্যেক নারীর কাছে তা বোধগম্য। এমন বিষয়সমূহ যদি সমাজে আরোপিত হয়, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধাগ্রস্ত হবে এটাই স্বাভাবিক।

বর্তমান বিশ্বে পুঁজি বিকাশে, বাণিজ্য বিস্তারে, যোগাযোগ বিনিয়োগে এই হচ্ছে বিজ্ঞাপনে নারী প্রতীক, নারীকে গণমাধ্যমে উপস্থাপন বা বিজ্ঞাপিত করার নমুনা। শুধু যে আমাদের দেশে এমনটা ঘটছে তা কিন্তু নয়। খোদ ইউরোপ আমেরিকাও থেমে নেই। বিপণনের হাতিয়ার হিসেবে বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে নারী প্রতীক ব্যবহার কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে ভাবতে পারেন? 'তবে দেখুন বিবিসি আয়োজিত 'টু রিয়েলিটি শো' কিছুদিন আগে 'টু বিজনেস রিয়েলিটি শো' তে বিপণনের কৌশল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর দুই মেয়েকে। সেই মেয়ে দুটো ফলের ব্যবসায় একজন আরেকজনকে পেছনে ফেলার জন্য অভিনব ও আদিম পন্থা অবলম্বন করে ক্রেতাদের প্ররোচিত করতে চাইছে- সেটিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে টিভি পর্দায়। ব্রিটিশ দুই তরুণী ফলের পসরা সাজানোর পাশাপাশি নিজেদের সাজিয়ে নিলেন বর্ণিল সাজে। ভালো ফল বিক্রির প্রস্তাব হিসেবে ওই দুই তরুণী যখন বলছিলেন, তখন তাদের হাত দুটি ছিল নিজেদের বুকের ওপর, বিশেষ ভঙ্গিমায়। অর্থাৎ তারা নিজ বুকে হাত রেখে পুরুষ ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করতে চাচ্ছিলেন। একজন তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কেন এরকম প্রলুব্ধ করার চেষ্টা? উত্তরে এক তরুণী ড্যামকেয়ার ভাব নিয়ে বলেছিলেন, 'ইট্‌স আওয়ার কোম্পানিজ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি'।

সম্প্রতি খবরের কাগজে একজন গাড়িক্রেতা ভদ্র মহিলার অভিজ্ঞতার কথা পড়লাম। ভদ্র মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে কাকরাইলে অবস্থিত মোটর গাড়ি বিক্রির দোকানে গিয়েছিলেন গাড়ি পছন্দ করতে। সেখানে দুজন কর্মরত সেলসগার্লের সাথে গাড়ি বিষয়ে কথা বলছিলেন। দুঃখের বিষয় সেখানে দুজনের একজনও গাড়ি বিষয়ক কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। অর্থাৎ তারা গাড়ির ব্যাপারে কিছুই জানেন না। শেষমেষ তারা জানালেন, তাদের কাজ কাস্টমারকে আকৃষ্ট করা। ঐ যে একটু আগে যেটা উল্লেখ করেছি 'ইটস ..... স্ট্র্যাটেজি। কথাটা একই। নারীরাই বা এমনভাবে নিজেদের উপস্থাপন করেন কেন? এমন জায়গায় নিজেদের নিয়ে যান কেন? নারীকে পুতুলের মতো সাজতে হবে। আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য ফর্সা হতে হবে- অমুক ব্রান্ডের ফেয়ারনেস ক্রিম মাখতেই হবে, প্রাণহরা রান্না করতেই হবে, অন্যথায় নারীর জীবনের কোন মূল্যই থাকবে না- এই বিষয়সমূহকে যদি সমাজের মাইন্ড সেটে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, আরোপ করা হয় প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে, তা হলে তো সে সব বিষয় তো সমাজের দোহাই দিয়ে নারীর উপর প্রসাধনের প্রলেপ

চাপিয়ে দেয়া হলো। নারীতো সমাজেরই অংশ, সমাজের মাইন্ড সেটের বাইরে তো নারী তখন আর যেতে পারে না। এর বাইরে কথা বলা মানে তো প্রথা ভাঙ্গা। প্রথা ভাঙ্গনের মতো পরিবেশ, পরিস্থিতি, মানসিক শক্তি ও সাহস কি সব মেয়ের আছে? আরোপিত বিষয়গুলো গণমাধ্যমের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়া হলে সমাজে তা তো প্রাধান্য বিস্তার করবেই। কারণ গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ, সমাজের বিবেক। বিশেষ করে আমাদের সমাজে নারীরা (নারী সমাজের বিরাট একটা অংশ) সমাজ সংসারকে অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার মতো প্রাধান্য বিস্তারে এখনও সক্ষম হয়ে ওঠেনি, সুতরাং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীকে সমাজে সংসারে বাবার বাড়িতে/শ্বশুরবাড়িতে অভিভাবকদের উপর নির্ভর করতে হয়। এই নির্ভরতার ক্ষেত্রে আরোপিত বিষয়গুলোর ভূমিকা সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেয়ে পরমুখাপেক্ষী করে তুলছে শুধু গণমাধ্যম আরোপিত সংস্কৃতির কারণে। সুতরাং বিপণনের হাতিয়ার বিজ্ঞাপন নারী প্রতীককে যেভাবে নাচাবে আমাদের নারী প্রতীক তো সে ভাবে নাচবেই, এটা তো স্বাভাবিক। আমাদের বুঝতে হবে গলদটা কোথায়? গলদটা সমাজে।

"নারীর উৎপাদনশীল ভূমিকার প্রশ্নটি বহুদিনের। উৎপাদনশীল খাতে নারীর অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনে নারীর ইতিবাচক ভূমিকা প্রমাণিত হবার পরও নারীকে মনে করা হয় অনুৎপাদনশীল এবং সৃজনশীলতাহীন। মনে করা হয়, নারীর প্রধান ভূমিকা সেবা আর মনোরঞ্জন। আর তাই নারীর সৌন্দর্য মার্কেট আরো বিস্তৃত এবং ক্যারিয়ার গঠনে নারীকে এদিকে ঠেলে দিয়ে তার অন্যান্য গুণাবলীর বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়। সৃজনশীলতার জগতে তার বিচরণকে সীমিত করে দেয়া হয়। যা তার অনুৎপাদনশীল ভূমিকাকে আরো প্রকট করে। নারী হয়ে পড়ে মেধাশূন্য, জ্ঞানহীন ও প্রযুক্তি ব্যবহারে অযোগ্য। ফলে একবিংশ শতাব্দীর যে চ্যালেঞ্জ, যেখানে জ্ঞান আর প্রযুক্তি হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার সেখানে নারীরা পিছিয়ে যাচ্ছে। নারী যদি এভাবেই মেধাকে পুঁজি না করে সৌন্দর্যকে পুঁজি করে অগ্রসর হয় তবে নিশ্চিতভাবে সে অনেক কিছুতেই পিছিয়ে পড়বে। আর মেধাপ্রযুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় পুরুষ থাকবে অগ্রগামী। তা দিয়ে সে সবকিছুকে করায়ত্ত করবে। আর বুদ্ধিহীন নারী তখন ঘুরপাক খাবে ফেয়ারনেস ক্রিমের যাদুর মিথ্যে মোহে, করতলগত হবে পুরুষের।

সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও অনুসন্ধিৎসা চিরন্তন। আর নারীরূপের রহস্যময়তাও শাশ্বত, আদি ও অনন্ত। সৌন্দর্যের চর্চা, সৌন্দর্যের প্রতি সচেতনতা নেতিবাচক কোনো বিষয় নয়। বয়স ধরে রাখা, সৌন্দর্য চর্চা, পোশাকে পারিপাট্য, ব্যক্তিত্বে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। কিন্তু তা কতটুকু? সৌন্দর্য কখনই কোনো মানুষের পরিপূর্ণতা নয়। সৌন্দর্য সাময়িকভাবে কোনো মানুষের সাফল্যের গাথা আর প্রতিষ্ঠার সোপান হতে পারে কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আর টিকে থাকার বাস্তবতায় জ্ঞান আর মেধা চর্চার অন্য কোনো বিকল্প নেই। সৌন্দর্য দিয়ে কিছু জয় করতে হলেও তাকে মেধা আর বুদ্ধি খাটাতে হবে। বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজ আর সামনে অস্তিত্বের যে যুদ্ধ তাতে নরম কোমল ত্বকের জন্য ঘন্টা ঘন্টা শুধু চর্চা করলে চলবে না। অন্তরের সৌন্দর্যকে বাড়াতে হবে, শক্তিমান হতে হবে। আর সেই শক্তি আর সৌন্দর্য হচ্ছে জ্ঞান আর মেধার চর্চা, প্রযুক্তির উপর দখল। সৌন্দর্যের মোহে ক্ষণিক কিছু অর্জন করা যেতে পারে কিন্তু দীর্ঘ পথের জন্য পাথেয় দরকার। নারীকে বুঝতে হবে বিশ্ব জুড়ে সৌন্দর্যের যে বাজার তাও মেধার দখলেই চলছে। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ কখনোই শুধু সৌন্দর্য দ্বারা সম্ভব হবে না। বিশ্ব সবসময়ই মেধার দখলে থাকবে। তাই নারীকে মেধা আর মননের চর্চাতেই অর্জন করতে হবে। না হলে সামনের দিনগুলো নারীর জন্য হবে পরাজয়ের আর গ্লানির।" (নূর কামরুন নাহার)

আত্মমর্যাদা বিবেচনায় যারা এর প্রভাবমুক্ত রাখতে পারবে নিজেকে, আর যারা প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না তারা প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাসভেগাসের সিজার্স প্যালেসে আমেরিকার সবোর্চ্চ পর্ণো অ্যাওয়ার্ড এভিঅএন-২০০৫ বিজয়ী পর্ণো অভিনেত্রী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত জেসমিন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ''আমি একটি পর্ণো ছবিতে শরীর দেখিয়ে পাই ৪ লাখ ডলার। নিজেকে মাংসপিন্ডই ভাবি। মানুষ আর ভাবতে পারি না''। জেসমিনের বয়স বেশি নয়, মাত্র ২২ বছর। জেসমিন ভয়াবহ সত্য কথাটিই বলেছিলেন। নিজেকে মানুষ ভাবলে পুতুলের মতো যেমন করে পুঁজি নাচায় তেমন করে কেউ নাচে না। মান সম্মানে আঘাত হানে এমন প্রতীক কেউ বনে না। বিজ্ঞাপনে নারী প্রতীকের অসম্মানজনক ব্যবহারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বর্তমান স্যাটেলাইট তথ্য প্রবাহের যুগে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মাঝে তথ্য সঞ্চালন ঘটে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। কাজেই তারা এসব বিষয়ে নিজেদের কতটুকু প্রভাবমুক্ত রাখতে পারবে এটা দেখার বিষয়। গণমাধ্যমে সাম্প্রতিক কালে idol নামের একটা অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয়। অনেক দক্ষতার প্রদর্শনে একজন idol হয়ে ওঠেন। নারীমুক্তির জন্য, সমাজে নারীর যথাযথ অবস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য, সর্বোপরি সমাজ-সংস্কারের জন্য রোকেয়া আধুনিক ক্ষমতাময়ী নারীর কথা ভেবেছিলেন। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রোকেয়া হলেন আমাদের অমর idol বা নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ icon। রোকেয়াকে স্মরণ করার সময় যেন আমরা তাঁর উপদেশ এবং আমাদের জীবনধারা তুলনা করে দেখি।

শাওয়াল খান
লেখক ও গবেষক

রা শে দা না স রী ন

নোবেল বিজয়ের শতবার্ষিকী
প্রসঙ্গ: *গীতাঞ্জলি*

২০১৩ সাল শেষ হয়ে এল। আলাদা করে এই বছরটা নিয়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা করা যায়, তা নিয়ে নিশ্চয়ই অনেকেই ভাবছেন। খবরের কাগজের সম্পাদকবৃন্দ বর্ষশেষ সংখ্যা বের করার জন্য হয়ত অনেকটা কাজ এর মধ্যে সেরে ফেলেছেন। আরও ক'দিন পর সে ব্যাপারটা ভাল করে টের পাওয়া যাবে। কিন্তু বাঙালির কাছে এই সালটার একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েই যাবে। ঠিক একশ' বছর আগে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনবদ্য কবিতা ও গানের মিলিত সেই বিখ্যাত গ্রন্থ *গীতাঞ্জলি*-র জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। সেই তখনকার বাংলায় আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ বেঁচেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। পৃথিবীর এমন মহৎ স্বীকৃতি পাবার পর আমাদের সমাজে তার কি প্রতিফলন হয়েছিল সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন তাঁরা। বিভিন্ন বিবরণী থেকে সে বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

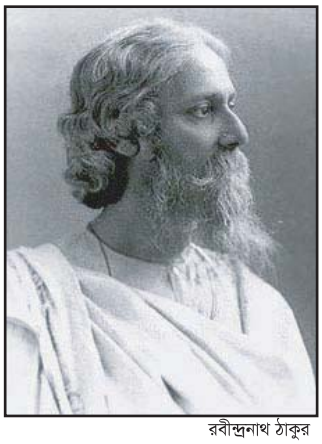
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিভিন্ন সূত্র থেকে পড়াশোনা করে যা জেনেছি, তাতে বোঝা যায়, এই পুরস্কার পাওয়া নিয়ে নানারকমের কথাবার্তা হয়েছিল। তার সবটাই যে সুখকর ছিল, তা নয়। যেকথাটি বার বার আলোচনায় এসেছে তা হল, এই পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে ইংরেজ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটসের ভূমিকা। এই বিষয়টা প্রায় সকলেরই জানা। তবুও কথাটা আবার এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। কারণ, এই ইংরেজ কবির প্রথম প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তিনি পরে যা বলেছেন তা প্রায় দুই বিপরীত মেরুর কথা। সেইজন্য বিষয়টি শুধু যে খুবই অপ্রীতিকর ও অশোভন তা নয়, এটাকে মানতে বেশ কষ্ট হয়। গত বছর এবং এ বছরও বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটসের মধ্যকার প্রাথমিক সৌহার্দ্য এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ কবির তির্যক মন্তব্য নিয়ে অনেক আলোচনা পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইয়েটস যেসব মন্তব্য প্রথমে করেছিলেন, সেগুলো পাঠ করলে আমাদের এখনও অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে যে অত্যন্ত গভীর আন্তরিকতা ছিল সেটা বুঝতেও কষ্ট হয় না। কারণ ইংরেজ কবি *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের যে সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন তা ছিল সব অর্থেই অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেন এবং পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্য বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহ আছে, এমন দু'একজনকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, ইয়েটস ওই ভূমিকায় যেসব কথা লিখেছিলেন, সেগুলো কি সত্যিই আন্তরিক? বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষকতা করেন এমন একজন নামী অধ্যাপক আমাকে বলেছেন যে, ইয়েটসের প্রশংসায় আন্তরিকতার কোন ধরনের ঘাটতি নেই। তিনি আর একটি মন্তব্য করেন, যা শুনে আমি খুব পুলকিত ও বিস্মিত হয়েছি। তিনি বললেন যে, কোন একজন খুব বিখ্যাত কবি অন্যদেশের আর একজন কবির গ্রন্থের এরকম দীর্ঘ ও প্রশংসাসূচক ভূমিকা লিখেছেন, তার দ্বিতীয় কোন নজির নেই।

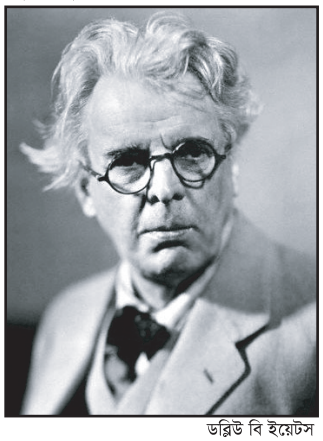
ডব্লিউ বি ইয়েটস

একথা জানার পর আমি তাঁরই সহায়তা কামনা করি। তিনি আমাকে *গীতাঞ্জলি*-র এমন একটা সংস্করণ পড়তে দিলেন, যেখানে ইয়েটসের ওই ভূমিকাটা রয়েছে। আমার ইংরেজি ভাষা জ্ঞান অত ভাল নয়। কিন্তু ওই ভূমিকা পড়তে গিয়ে আমি সত্যি কথা বলতে কি একদম অভিভূত হয়ে গেছি। একবার পড়ার পর ভালভাবে বুঝিনি। তবে এটা টের পেয়েছি যে, এই ইংরেজ কবি যা বলছেন তা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই বলেছেন। সেখানে কোন খাদ নেই। *গীতাঞ্জলি*-র বিভিন্ন গান ও কবিতা আমাদের অনেকেরই জানা, অনেকগুলো তো প্রায়ই শোনা যায় রেডিও, টেলিভিশন বা ক্যাসেটে। শুনে শুনেও আমাদের অনেকের গলায় সুরটা চলে আসে। আবার বাণীও এত অসাধারণ যে, তা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়, ভুলতে পারি না।

যাই হোক, ইয়েটসের ভূমিকা পড়ে আমার মনের মধ্যে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। মনে হল, আমি *গীতাঞ্জলি*-র ওইসব অপূর্ব সুন্দর রচনাগুলো আগে বুঝি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে পড়িনি। তাই কবি ইয়েটসের কথাগুলো আমার কাছে এমন গভীর ও মোহময় মনে হচ্ছে। আমি এই ২০১৩ সালে, যখন এই বইটা নিয়ে চারদিকে নানান মাতামাতি হচ্ছে, তখন আবার নতুন করে পড়তে লাগলাম। বেশি করে পড়েছি সেই সব গান যা ছোটবেলা থেকে

শুনেছি। পরিচিত গানগুলির ভেতর চেনা সুরের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। এইখানেই একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল। দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের বাণীর চেয়ে আমার অনুরাগের ঝোঁকটা অনেক বেশি পড়ছে সুরের ওপর। কিন্তু ডব্লিউ বি ইয়েটস তাঁর ভূমিকায় যে গভীর আবেগের সঙ্গে তাঁর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, সে তো নিশ্চয়ই গান বা কবিতাগুলির কথা নিয়ে। বিশেষ করে এই নতুন করে পাঠ করার সময় অর্থাৎ ইয়েটস যে কেন এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বোঝার প্রচেষ্টায় আমার কয়েকটা গানের কথা মনে হয়েছে। তেমন দু'টি গানের বাণী উদ্ধৃত করতে চাই।

দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে–
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে–
স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে,
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মুদিয়া পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।

অথবা

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত।

একইরকম গভীরতার আবহভরা আরো অসংখ্য গান আছে। সেটাও যেন এবার নতুন করে আবিষ্কার করলাম। কবি ইয়েটসের ওই ভূমিকা যে সত্যিই অসাধারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভূমিকাটাও একাধিক বার পড়ে নিজের মত করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম। ওই বিদেশী কবিকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই দু'টি কারণে। এক, তিনি গীতাঞ্জলি-র জন্য অত দীর্ঘ এবং ভাষা ও অনুভবে খুবই ঋদ্ধ একটি ভূমিকা লিখে দেবার সূত্রে নিশ্চয়ই ইউরোপের অনেক পাঠক রবীন্দ্রনাথকে আরো ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন। আর দ্বিতীয় কারণ হল, আমিও যেন ওটা পড়ার পর বিশেষ করে গীতাঞ্জলি-র অনেকগুলো গান আরো গভীরভাবে অনুভব করতে পারলাম। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমার এমন মনে হয়েছে যে, ইয়েটসের লিখিত ভূমিকা অনেকেই পড়েননি। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অত বেশি চর্চা করেন না, তাঁরা হয়ত বিষয়টা সম্পর্কে জানেনও না। তাই ভাবলাম, ওখান থেকে কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে দিই। তা করতে গিয়েও বেশ একটু মুশকিলে পড়েছি। প্রায় সবটাই এত ভালো ভালো কথা। তবুও কয়েকটা লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি। তা থেকে বেশ স্পষ্ট করেই বোঝা যাবে যে, ইয়েটস প্রকৃতপক্ষে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে কত বড় মাপের কবি বা দার্শনিক বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি মহৎ সব ইংরেজ কবিদের কাতারেই রবীন্দ্রনাথকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

> Rabindranath Tagore, like Chaucer's forerunners, writes music for his words, and one understands at every moment that he is so abundant, so spontaneous, so daring in his passion, so full of surprise, because he is doing something which has never seemed strange, unnatural, or in need of defence. These verses will not lie in little well-printed books upon ladies' tables, who turn the pages with indolent hands that they may sigh over a life without meaning, which is yet all they can know of life, or be carried by students at the university to be laid aside when the work of life begins, but, as the generations pass, travellers will hum them on the highway and men rowing upon the rivers. Lovers, while they await one another, shall find, in murmuring them, this love of God, a magic gulf wherein their own more bitter passion may bathe and renew its youth. At every moment, the heart of this poet flows outward to these without derogating or condescension, for it has known that they will understand; and it has filled itself with the circumstance of their lives. The traveller in the red-brown clothes that he wears that dust may not show upon him, the girl searching in her bed for the petals fallen from the wreath of her royal lover, the servant or the bride awaiting the master's home-coming in the empty house, are images of the heart turning to God. Flowers and rivers, the blowing of conch shells, the heavy rain of the Indian July, or the moods of that heart in union or in separation; and a man sitting in a boat upon a river playing lute, like one of those figures full of mysterious meaning in a Chinese picture, is God Himself. A whole people, a whole civilization, immeasurably strange to us, seems to have been taken up into this imagination; and yet we are not moved because of its strangeness, but because we have met our own image, as though we had walked in Rosetti's willow wood, or heard, perhaps for the first time in literature, our voice as in a dream.

ডব্লিউ বি ইয়েটসকে নিয়ে এত কথা বলব, তা ভাবিনি। খুব ভেবেচিন্তে যে এই রচনায় হাত দিয়েছি তাও নয়। তাছাড়া এ বিষয়ে লেখার জন্য যে ক্ষমতা লাগে, তাও আমার নেই। কথাটা খুবই অকপটে স্বীকার করতে চাই। তবে এই ২০১৩ সালে, *গীতাঞ্জলি*-র নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবার শতবর্ষ তো আর কোনোদিন আসবে না। রবীন্দ্রনাথ তো *গীতাঞ্জলি* বাদে তাঁর আর অন্যান্য অসংখ্য লেখার জন্য আমাদের মাঝে অমর হয়ে বেঁচে থাকবেন। সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই।

গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে এবার অনেকরকম আলোচনা পড়েছি। সেসব পড়ে মনে হল, তাঁর এই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বইটা নিয়ে বিতর্কটা হয়ত

চলতেই থাকবে। বাংলা *গীতাঞ্জলি*, তার আবার নতুন সংযোজন ও পরিবর্ধন; বাংলাটার সঙ্গে ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-র অমিলও অনেক। এসব যখন জানলাম, তাতে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলটাও বাড়তে থাকে। কিন্তু তার মাধ্যমে হয়ত যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক আলোচনা ও চর্চা করেন, তাদের জন্য কিছু লাভ হতে পারে। তবে নতুন করে *গীতাঞ্জলি* (অবশ্যই বাংলা) পড়তে গিয়ে মনে হল, এই অসাধারণ গ্রন্থটা নিয়ে আমরা সাধারণত যা ভাবি অথবা যা ভেবে আপ্লুত হই, তার অতিরিক্ত অনেক কিছু এর ভেতরে আছে। যেহেতু মূলকথা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে যে, এর মধ্যে কবির খুব গভীর অন্তর্গত বোধ প্রকাশ পেয়েছে, আমরা সেটারই খোঁজ করি এবং খোঁজ পেয়ে আপ্লুত হয়ে যাই। কবির মধ্যে যে এক ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র ঈশ্বরচেতনা কাজ করে, সেই কথাটিই শিখেছি আমরা।

অবশ্য তার মধ্যে কোন ভুল বা বিরোধ নেই। পুনরায় *গীতাঞ্জলি* পড়তে গিয়ে নতুন করে মনে হল, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এটা সাজিয়েছেন, তার মধ্যে কোথাও কোথাও এমন বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে ঠিক অন্য গানগুলির সঙ্গে একই সুরে মিলিয়ে নিতে পারি না। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরানসখা বন্ধু হে আমার' অথবা 'প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে, দেখা নাহি পাই, পথ চাই, সেও মনে ভাল লাগে' অথবা 'আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব' অথবা 'তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব' অথবা 'নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা' এমন আরো অনেক গান আছে, যেগুলিকেই *গীতাঞ্জলি*-র প্রধান সম্পদ বলে মনে করা হয়। আমার একথা মনে হয়েছে, ডব্লিউ বি ইয়েটস ও আরো অন্যান্য কয়েকজন ইউরোপীয় সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী যে অপরূপ অমৃতপথের সন্ধান পেয়েছেন, তার মূলে রয়েছে এইসব গানের প্রাধান্য। রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়, *গীতাঞ্জলি*-র মধ্যে *গীতিমাল্য* ও *গীতালি* কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এই বইটির নামের সঙ্গে 'অঞ্জলি' শব্দটি জুড়ে দিয়ে অসীম বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এই অনুভব ও অভিজ্ঞতা কোন একজন ব্যক্তি শুধু অন্তর দিয়েই বুঝতে পারেন। এইসব অসামান্য আত্মিক অবগাহনের গানের সঙ্গে তিনি যখন লেখেন,

'এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করে অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

অথবা

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান!
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তখন এই কবিতাগুলি, কোনভাবেই এক সুরে মেলানো যায় না। আবার অন্য কয়েকটি কবিতাকেও আলাদা করে নেয়া যায়, যেগুলিকে বরং *গীতবিতান*-এর প্রকৃতি পর্যায়ে অনেক মানানসই মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে: আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে; আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে; আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে; শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে; এসো হে এসো সজল ঘন বাদলবরিষনে–; আজি বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে; আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে; আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে; আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়, আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আজি শ্রাবণ ঘন-গহন-মোহে প্রভৃতি। অসাধারণ সব গান, যার মধ্যে ঈশ্বর বা প্রেয়কে খুঁজে পাবার আকুতি আছে, কিন্তু 'প্রকৃতি' এইসব গানে এমন অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে যে তার সঙ্গে ইয়েটস যে গভীর ভাববাদী চেতনার কথা বলেছেন, সেটা অতিক্রম করে বাংলার প্রকৃতি যেন অধিক অর্থবহ হয়ে ওঠে।

গীতাঞ্জলি আরো মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। এমন একটা প্রতিজ্ঞা করেছি মনে মনে। তবে নতুন করে আবিষ্কারের মধ্যে আরো একটা জিনিস হল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা। আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে মৃত্যু বিষয়ে দুই বিপরীত চিন্তার কথা বার বার উল্লেখ করি। *ভানুসিংহের পদাবলী*-তে যেমন বলেছেন, 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' আবার অন্যত্র লিখছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। *গীতাঞ্জলি*-তে মরণের কথা এসেছে নানাভাবে; কে বলে সব ফেলে যাবি মরণ হাতে ধরবে যবে; মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে; ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা/মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা; তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর/যবে আমার জীবন হবে ভোর। চলে যাব নবজীবন লোকে/নতুন দেখা জাগবে আমার চোখে।

গীতাঞ্জলি সত্যিই এক বিশাল ও অফুরান পাঠসম্ভার। আরো কতভাবে যে এই গ্রন্থ পাঠ করা যায়, তা বলে শেষ করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। আমার বিশ্বাস, একশ' বছর পেরিয়ে ২১১৩ সালে মনোযোগী, অনুরাগী, অধ্যাত্মবাদী এবং বৈষয়িকতাবাদী সকল পাঠকই *গীতাঞ্জলি* থেকে তার প্রয়োজনীয় মানসিক, মানবিক ও আত্মিক রসদ ও সম্পদ আহরণ করতে পারবেন।

রাশেদা নাসরীন
প্রশিক্ষক
PACE কর্মসূচি, ব্র্যাক

এ এম রাশিদুজ্জামান খান

বাংলাদেশের শিক্ষাভাবনা ও অর্জন

ডিসেম্বর। শৃঙ্খলমুক্তির, আনন্দের মাস এদেশবাসীর। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানের তেইশ বছর ছিল এদেশের মানুষের জন্য এক ঘোর দুঃসময়। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পর থেকে কেবল জুলুম আর পদে পদে নিপীড়ন। অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসেছিল এদেশের মানুষের বুকের ওপর। টুঁটি টিপে ধরেছিল আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির, রুদ্ধ করে দিয়েছিল প্রগতির পথ। সর্বশেষ সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় লাভের পরও জনরায়কে উপক্ষো করে শাসন-শোষণ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীকে পূর্ববঙ্গে গণহত্যা শুরু করে।

একাত্তরের ন'মাসে পাকিস্তানের পশুশক্তি এদেশীয় কিছু কুলাঙ্গারদের সহায়তায় বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করে। ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইটের নামে ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করে, নির্যাতন-অত্যাচার চালিয়েছে অবরুদ্ধ এদেশের মানুষের উপর, কেড়ে নেয় দুই লাখ নারীর সম্ভ্রম। দেশকে মুক্ত করার প্রত্যয়ে শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। যার অবসান ঘটে ১৬ ডিসেম্বর, রক্ত-খচিত লালসবুজের পতাকা অর্জন এবং পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি নুতন রাষ্ট্রের জন্ম হবার মধ্য দিয়ে।

আমাদের এই যুদ্ধ কী কেবল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ছিল? না, এই যুদ্ধ ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যেও। সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা হচ্ছে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হল রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বা অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে মানুষের সমষ্টিগত মুক্তির চেতনা, সমাজ পরিবর্তনের চেতনা, কেন না শোষণভিত্তিক সমাজকাঠামোতে পরিবর্তন না আনতে পারলে মুক্তি অসম্ভব। এর মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হবে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও মানবিক সমাজ। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ এই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে। এটি ছিল একটি সমষ্টিগত স্বপ্ন।

গণতান্ত্রিক পন্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের করণীয় অনেক। প্রতি বছরই ১৬ ডিসেম্বর আসে। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষের দিকে কতটুকু এগুতে পেরেছি, আনতে কি পেরেছি সমাজে পরিবর্তন এবং এটাও বলে দেয় যে, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের সমষ্টিগত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা।

সমাজে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা তথা মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হলে নাগরিকদের নিজ দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রধানতম উপায় হল শিক্ষা। আর তাই বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'সবার জন্য শিক্ষা' এই চেতনার স্বীকৃতি রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে। এই সংবিধানের বেশ কয়েকটি ধারায় শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তথাপিও আমাদের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলে উল্লেখ করা হয়নি। কথাটা আক্ষরিক অর্থে ঠিক। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি না দেবার ফলে সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা হয়ে উঠেছে একটি বড় ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য; যেখানে অধিকার ও সমতার

ভিত্তিতে নয় বরং সুযোগের ভিত্তিতে এটি অর্জনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ রাষ্ট্র যদি যথাযথভাবে পালন করে তবে তা মৌলিক অধিকারের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে ওঠে।

সাধারণ অর্থে, স্কুল কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস অনুযায়ী লেখাপড়া করে বিদ্যার্জন করাকে শিক্ষা বলা হলেও শিক্ষা মানে জানা বা জ্ঞান অর্জন করা, নতুন কিছু শেখা, অজানাকে জানা। 'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Education গ্রীক শব্দ educare থেকে এসেছে, যার অর্থ পরিচর্যা করা। অর্থাৎ শিক্ষা হলো, একজনকে পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। আবার শিক্ষা হলো, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার কৌশল অর্জন এবং মানবিক গুণাবলী অর্জন।

কিন্তু প্রায়শই শোনা যায় আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে না। আর এই অভিযোগ অনেকাংশেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়–যখন দেখি একজন সহপাঠী আরেকজন সহপাঠীর দ্বারা নানাভাবে নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে, একজন শিক্ষকের লালসার বলি হচ্ছে তারই ছাত্রী কিংবা একজন নিরীহ কৃষক হয়রানির শিকার হচ্ছে নানাভাবে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীর দ্বারা।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সংকটের সাথে আজ আমরা প্রতিনিয়ত মুখোমখি হই, তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে। লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল সনদ অর্জন করে ব্রিটিশ শাসকদের কাজে সহায়তা করে উপার্জনের আনুকূল্য পাওয়া, অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জনগণের কল্যাণ মূল উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মেকলে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেন, 'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect'.

মেকলে চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর পরগাছা শিক্ষিত সমাজ তৈরি করা যারা উপনিবেশের কেরানি হিসেবে সেবা দেবে। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের পরিকল্পনাকেই ১৮৩৫ সালে সরকারি শিক্ষানীতি হিসেবে ঘোষণা করেন। বাংলার শিক্ষায় মেকলে নীতি গৃহীত হবার ফলে মেকলে পরিকল্পনার ফল (চামড়ায় ভারতীয় কিন্তু মানসিকতায় ইউরোপীয়) পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ফলে। বাংলাদেশে শেকড়ছাড়া শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি হতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়েও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। ঔপনিবেশিক ও পশ্চাদপদ শিক্ষা কাঠামো এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আজও। বরঞ্চ রাষ্ট্রের দায়িত্বে সবার জন্য একই ধরনের শিক্ষার কথা থাকলেও এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা-ইংরেজী ভিত্তিক দেশী-বিদেশী-মিশ্র ধারার স্কুল এবং আরবী ভাষার প্রধান প্রধান মাদ্রাসার সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

বিজয়ের ৪২ বছর পেরিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না যে, ব্রিটিশদের উপনিবেশবাদী শিক্ষানীতি বাংলাদেশের মতো উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় দেশে একেবারেই অচল। গৎবাঁধা পুঁথিগত কিছু মুখস্থ বিদ্যার এ শিক্ষাব্যবস্থা মেধা বিকাশে অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। এ কারণেই ওই সব শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও বাস্তবে কোন সফলতাই আসছে না। বর্তমান অবস্থায় প্রগতির জন্য পরিবর্তন অতীব জরুরি হলেও সনাতনী সেই শিক্ষা ব্যবস্থার জাল ছিড়ে বের হয়ে আসা আজও সম্ভব হয়নি। উপরন্তু স্বাপ্নিক উন্নয়নের আশায় নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিয়েছি মাতৃভাষার বিপরীতে ইংরেজী ভাষাসহ আরো বিদেশী ভাষা।

আর তাই আমাদের সন্তানদের বাংলার সহজাত আর দশটা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ততা লাভ না করার কারণে তার মনমানসিকতায় কী মাতৃপ্রেম, কী দেশপ্রেম, কী মানবপ্রেম, কোনটিরই উন্মেষ ঘটে না। তাদের কাছে ব্যক্তিপ্রেম প্রাধান্য লাভ করে। এই মানসিকতার কারণেই তারা মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে, বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে বাবা-মা স্বজনদের কাছ থেকে। আর এই বিচ্ছিন্নতা থেকেই আরো বেশী দূরে সরে যাওয়া, যার ফল নিজস্বতাকে এক সময় হারিয়ে শিকড়হীন হওয়া।

আঠারো শতকের শেষ দিকে ইংরেজি শিক্ষাবিমুখ বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতা মাদরাসা। তখন থেকে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ২৩ বছর ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ৪২ বছর, প্রায় দেড়শ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মানের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন তেমন ঘটে নি।

আমাদের দেশে যে-রূপ নানামাত্রিক বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে তন্মধ্যে মাদরাসা শিক্ষার একটি বিপুল অংশ হল কওমি মাদরাসা। এসব মাদরাসা সরকারের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকায় কওমি মাদরাসার শিখন শিক্ষণ বিষয়ে এখনও আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। তবে বিগত কয়েক দশকের শিক্ষা ও সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে,

সামগ্রিকভাবে মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া কেবলমাত্র সরকারী স্বীকৃতি বা সনদ প্রদান করেই এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জীবনমানের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়।

স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও শিক্ষা অধিকারের ধারণা ব্যাপক ভিত্তিতে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়নি এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিও সম্ভব হয়নি। শিক্ষা অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশই এখনও বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে 'সূর্যের আলোটা যেন গৃহকোণেও প্রবেশ করে'- এই লক্ষ্য অর্জিত হয় নি। অনেকে নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানকে পাঠিয়েই দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের উপস্থিতি, বিদ্যালয় ঠিকমতো চলছে কিনা, ইত্যাদি জানা-বোঝার প্রয়োজন মনে করেন না। অথচ 'মানসম্মত শিক্ষা' বিশ্বজুড়ে একটি বড় আন্দোলন; যেখানে বাংলাদেশকে এর বাইরে রেখে বিবেচনার সুযোগ নেই। সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে একটি আইনও আমাদের রয়েছে। কিন্তু এই আইনে যা নেই তা হলো মানসম্মত শিক্ষার একটি সংজ্ঞার কথা। ফলে শিক্ষালয়ের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিপুল প্রসার ঘটলেও এক্ষেত্রে শিক্ষার তেমন কোন গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি।

রবি ঠাকুরের ভাষায়, তাই 'আমাদের বেশির ভাগ স্কুল কারাগারের মতো, পঠন পাঠন ছাত্রদের ওপর কেবল নিরানন্দ বোঝা, শিক্ষা অনেকটা শৃঙ্খলের মতো হয়ে উঠেছে। আর আমাদের শিক্ষকেরা নীরস বদন নিরানন্দ মানুষ কিংবা মেজাজী রাগী মানুষ। তাদের কাছ থেকে ভয় যত মেলে, উৎসাহ ততটা নয়, না যত শোনা যায়, হ্যাঁ ততটা নয়। তদুপরি, সিলেবাস আর পরীক্ষার দায় মেটাতে ছাত্রদের অধিকাংশ মনের দাবিগুলো তাদেরই অন্তরে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা ভালো ছাত্র (ফলাফলের দিক থেকে) তৈরি করতে পারি, কিন্তু ভালো মানুষ তৈরির গ্যারান্টি দিতে পারছি না।'

'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা'য় সংবিধান প্রণেতাদের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে এই অভীষ্টকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য একাধিক কর্মসূচি গৃহীত হলেও, চার দশকেরও বেশী সময় আগে রচিত সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কে জাতির যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে তার সামান্য অংশই আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। সাদা চোখে যা দেখা যায় তা হলো, ১৭(ক) ধারার প্রথম অংশ বাস্তবায়িত হয় নি; যেখানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সকলের জন্য একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবে। এটি বাস্তবায়ন করার কোন কার্যকর পদক্ষেপ বা তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনসমূহেও উপর্যুক্ত আশাবাদের পাশাপাশি সব পদ্ধতিকেই এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করতে দেখা যায়। ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়িত হচ্ছে বলা যায়, কিন্তু কবে নাগাদ কাজটি সমাধা হবে, আইনে তা বলা না থাকায় অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

তবে একথা সত্য স্বাধীনতার ৪২ বছরে শিক্ষায় আমাদের অর্জন একেবারে শূন্য তাও ঠিক নয়। রাষ্ট্র সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য গ্রহণ করেছে নানাবিধ পদক্ষেপও। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈনতিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি হিসাবে নেয়া হয়েছিল, যা পরবর্তী কালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম হিসাবে চালু রয়েছে। নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু রয়েছে। সরকারি নানা উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের ফলে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে স্বাক্ষর করতে সক্ষম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি ১০০ জনে ৪৩ জন, অর্থাৎ সার্বিক সাক্ষরতার হারের অগ্রগতি ঘটেছে শতকরা ৭২ ভাগ। বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে। ১৯৭০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫,২৮৩,৭৮৭ আর ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৬,৯৮৭,১১০। বিশ্বব্যাংকের ২০১২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ছিল ১ঃ৫০.৬৯ সেখানে ২০১০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১ঃ৪২.৯৭। ১৯৭০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে মোট শিক্ষক ছিল ১১৩,৬৭৩ জন, ২০১০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৯৫,২৮১ জন। শিক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তন। ১৯৭৪ সালে যেখানে জিডিপি'র ১.১১% শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হতো ২০০৯ তা দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২.২৩%। ২০১০ সালে আমরা পেয়েছি একটি শিক্ষানীতি, যা বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পরিবর্তন আসবে বলে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা, অসমতা ও পশ্চাদপদতার কারণসমূহ অনুসন্ধানে দরকার গভীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা। তারপর দরকার গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সমতাভিত্তিক যথাযথ নীতি প্রণয়ন এবং এই নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। এর ফল স্বরূপ শিক্ষা উন্নয়নসহ শিক্ষার কাঠামোগত পরিবতনের্র মাধ্যমে নিশ্চিত হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অধিকার।

এ এম রাশিদুজ্জামান খান
উন্নয়নকর্মী

শা ন্ত নু দে

শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়ন

সাম্প্রতিক সময়ে বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার, মর্যাদা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি চাকুরীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়োগে বয়সসীমা বৃদ্ধি, বিসিএস ও ১ম ও ২য় শ্রেণীর চাকুরীতে ১% কোটা, পাবলিক পরীক্ষায় শ্রুতিলেখকনির্ভর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সময় বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর রেয়াত, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও বিটিভিসহ বেসরকারি টিভি সংবাদে বাংলা ইশারা-ভাষায় সংবাদ উপস্থাপন, ভর্তির সুবিধা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাইরে অটিজম বিষয়ে সাতটি মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগসহ নানামুখী কার্যক্রম। এছাড়াও প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স ও প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স একনেকের অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও উন্নয়নে সরকারের উল্লিখিত কার্যক্রমের বাইরে প্রক্রিয়াধীন যুগান্তকারী কার্যক্রম:

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার আইন ২০১৩

২. প্রতিবন্ধী অধিদফতর স্থাপন

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদ (সিআরপিডি) এর অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে তা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে একদিকে যেমন তাদের মূলধারায় আনার প্রচেষ্টা রয়েছে, তেমনি বিদ্যমান বিভিন্ন বাধা অপসারণ ও একীভূত উন্নয়ন প্রক্রিয়াও বিরাজমান। বর্তমান সরকারের এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের নতুন ধারা সূচিত হতে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ পরবর্তী শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৪৬ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগের পর ২০০৮ সাল থেকে সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাব, শিক্ষা, নারী উন্নয়ন, প্রাক শৈশব বিকাশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন নীতিতে প্রতিবন্ধী মানুষের ইস্যুসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, মহিলা অধিদফতর, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ না করলেও প্রতিবন্ধী মানুষের সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের হিসেব অনুযায়ী ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। তবে এটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই, জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেটের পর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যেমন নারী উন্নয়নের মূল দায়িত্ব পালনকারী কর্তৃপক্ষ ও সমন্বয়ক, তেমনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উন্নয়নের মূল দায়-দায়িত্ব এবং সমন্বয়কের ভূমিকায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর। বর্তমানে প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী হিসেবে সমাজসেবা অধিদফতর আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃঅধিদফতর সমন্বয়কের ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নের মূলধারায় প্রতিবন্ধী মানুষের আনায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমন্বয়কের ভূমিকায় বর্তমান নীতির সাথে কোন বিরোধ বা সংঘাত সৃষ্টি করে না।

শিক্ষা: শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত ৭টি বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে। ২০০৮ সালে ঝিনাইদহ সরকারি শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মিত হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়নি। শুধুমাত্র ঢাকা বধির উচ্চ বিদ্যালয় হতে শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি বিশেষ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের বাংলা ইশারা ভাষা এবং এই শিশুদের শিক্ষণ পদ্ধতির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই। শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই নিজেদের বিকশিত করে থাকেন। সাধারণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দু একজন ব্যতিক্রম ছাড়া এই বিষয়ে কোন ধারণা নেই বললেই চলে। যদিও সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের হিসেবে প্রায় ৩৫০০০-এর বেশি শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। তাই শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও বিকাশ নিশ্চিত করতে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত বিশেষ বিদ্যালয়গুলোকে রিসোর্স বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এই রিসোর্স বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবাই বাংলা ইশারা ভাষা এবং শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষায় অংশগ্রহণ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন। রিসোর্স বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা

ধারাবাহিকভাবে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ প্রদান করবেন। এছাড়াও একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিটিআই-এ প্রশিক্ষক (শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা) পদ সৃষ্টিসহ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। বেশির ভাগ শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়ার সুযোগ পায় না। তাই সরকারি বিশেষ বিদ্যালয়গুলোকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উন্নীত করা প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা ইশারা ভাষার দক্ষতা পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

প্রাক-শৈশব বিকাশ শিশুর জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশু এক বছরের মধ্যে শনাক্তকরণের জন্য প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে অডিওলজিক্যাল সেবা কার্যকর করা প্রয়োজন। এজন্য প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের টেকনিশিয়ান (অডিওলজি সেবা) পদের ব্যক্তিদের সম্প্রতি উদ্বোধনকৃত জাতীয় নাক কান গলা ইন্সটিটিউটে তিন মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে সকল কেন্দ্রে অডিওমিটারের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। বিশেষভাবে আড়াই কেজির কম ওজনের শিশুর শ্রবণ পরীক্ষা চালু করা প্রয়োজন। এসব শিশুর অভিভাবকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যাবশ্যকীয়। এছাড়াও সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও ছোটমণি নিবাসে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষায়িত সেবা দেয়া প্রয়োজন।

কর্মসংস্থান: বেশির ভাগ শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষ যেহেতু শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থেকে যায়, তাই তাদের বেশির ভাগই দিনমজুর বা কর্মহীন মানবেতর জীবনযাপন করে। সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য যে ভাতা প্রদান করে থাকে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষরা সাধারণত এই সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকে। কেননা তারা এইসব সুবিধা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে ভাষার প্রতিবন্ধকতার জন্য যোগাযোগ করতে পারে না। শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষদের ছবি আঁকা বা সাইন বোর্ড লেখা, টেইলারিং, অটোক্যাড ডিজাইনিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং সম্প্রতি গার্মেন্টেসে কাজ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্যোগে বা সমন্বয়ে এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাদেরকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। মূলত ভাষার প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হলে তাদের যে কোন ধরনের কাজেই দক্ষ করে তোলা সম্ভব।

নাগরিক অধিকার ও জীবনমান উন্নয়ন: সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবন্ধী মানুষদের নাগরিক অধিকার এবং জীবনমান উন্নয়নে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য বেশ কিছু কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। কিন্তু শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষদের ক্ষেত্রে এই চিত্র যথেষ্ট হতাশাজনক। ভাষা বা পারস্পারিক যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতার কারণে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সরকারি বিভিন্ন সেবাকেন্দ্র, থানা, আদালতসহ জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ইশারা ভাষার দোভাষীর সহায়তা ছাড়া শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষদের নাগরিক অধিকার বা সেবা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এজন্য সমাজসেবা অধিদফতরের প্রতিটি জেলা কার্যালয়ে একজন বাংলা ইশারা ভাষী দোভাষী নিয়োগ অপরিহার্য। এই সব কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগসহ বাংলা ইশারা ভাষার গবেষণা, বিকাশ ও দোভাষী তৈরি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলা ইশারা ভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপন একান্ত প্রয়োজন।

সমাজসেবা অধিদফতরের সমন্বয়ে সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম নেয়া প্রয়োজন। শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে ভাষাকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার জন্য এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। এমনকি অভিভাবকদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় মানসিক বিপর্যয় দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে উভয়ের জন্য মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

একসময় ঢাকার টঙ্গীতে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র (হিয়ারিং এইড) উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানের তা সম্পূর্ণ অকার্যকর। এই প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে সহজলভ্য এবং ১৮ বছর কম বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ছয়টি নিরাপত্তা আশ্রয় (সেফ হোম) এবং গাজীপুরে ভবঘুরে কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে একাধিক শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী রয়েছে। এসডিএসএল এইসব প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের সহায়তা করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে আশ্রয় নেয়া, হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে এসডিএসএলের বিশেষ সহায়তায় বাড়ি পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি বর্তমানে আলোচিত। সমাজসেবা অধিদফতরের নিরাপত্তা আশ্রয় ও ভবঘুরে কেন্দ্রসমূহ প্রতিবন্ধী বান্ধব করার জন্য বিশেষায়িত লোক নিয়োগের পাশাপাশি নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের মাধ্যমে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষদের সঠিক পরিসংখ্যান এবং আনুসাঙ্গিক তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাবে। আমরা আশা করি এর ভিত্তিতে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

শান্তনু দে
সমন্বয়ক, এসডিএসএল

[সমাজসেবা অধিদপ্তর-এ ৪ জুলাই ২০১৩ তারিখে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা ও জীবনমানের পরিপ্রেক্ষিত এবং উন্নয়ন কার্যক্রম শীর্ষক কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।]

১ জানুয়ারি নতুন বই পৌঁছানো অনিশ্চিত

লাগাতার অবরোধের কারণে উদ্বিগ্ন এনসিটিবি

অবরোধ-সহিংসতার কারণে আগামী ১ জানুয়ারি সারা দেশে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছানো অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। দু'দফার অবরোধে প্রায় ৮ কোটি বই আটকে পড়ছে ছাপাখানাগুলোয়। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সব জেলা-উপজেলায় নতুন বই পৌঁছানো কঠিন চ্যালেঞ্জ মনে করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বোর্ড কর্মকর্তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই পৌঁছানো নিয়ে উদ্বিগ্ন।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৮ দলীয় জোটের অবরোধ কর্মসূচির কারণে গতকাল শনিবার ভোর ৬টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত টানা ৭২ ঘণ্টা দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় বই সরবরাহ বন্ধ। গত ২৬, ২৭, ২৮ নভেম্বর ৭১ ঘণ্টার অবরোধে ৪ দিন বন্ধ ছিল বই সরবরাহ। এর আগেও হরতালের কারণে ২৭-২৯ অক্টোবর এবং গত ৪, ৫, ৬, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নভেম্বর ৭ দিন বিভিন্ন জেলায় বই পাঠাতে পারেনি বই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

বোর্ডের বিতরণ ও নিয়ন্ত্রণ শাখার তথ্যানুযায়ী, গত ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ৯ কোটি ৫৬ লাখ ৬৪ হাজার ৮৭৮, মাধ্যমিক স্তরের ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৫৮ হাজার ৫৪৬ এবং মাদ্রাসার ২ কোটি ৫৪ লাখ ৯৩ হাজার ৪৯৭ বই বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় পৌঁছানো সম্পন্ন হয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান মো. শফিকুর রহমান আমাদের সময়-কে বলেন, প্রায় ৩০ কোটি বই ছাপানোর কাজ করছে এনসিটিবি। টানা অবরোধের কারণে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। ছাপানো বই জায়গার অভাবে রাখতে পারছেন না ছাপাখানার মালিকরা। ২০১৪ সালের নতুন বই ১ জানুয়ারি সারা দেশে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো চ্যালেঞ্জ হয়েছে এনসিটিবির জন্য। এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, এখন দেখা যায় হরতাল বা অবরোধ ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ামহল্লায় শুরু হয় গাড়ি ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ। এ কারণে হরতালের আগের রাতও পাঠ্যবই পরিবহন বন্ধ রাখা হয়। এ কারণে একদিন কর্মসূচি থাকলেও দুদিন বন্ধ থাকে বই পরিবহন।

বই বিতরণ শাখার কর্মকর্তা মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া জানান, প্রতিদিন গড়ে ২৫ থেকে ৩০ লাখ বই বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। দুই দফায় অবরোধের কারণে ৮ দিন সরবরাহ বন্ধ থাকায় প্রায় ২ কোটি বই আটকে যাবে ছাপাখানায়। এভাবে টানা অবরোধ থাকলে ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছাবে কি না সন্দেহ রয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন। বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দিয়ে সারা দেশে একযোগে পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করে আসছে।

প্রথম আলো ০১.১২.২০১৩

সরকারি স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু

অবরোধে নিষ্প্রাণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি নিতে রাজধানীসহ সারা দেশের সরকারি স্কুলগুলোয় ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে গতকাল রোববার। ১৮ দলীয় জোটের অবরোধের কারণে ভর্তি ইচ্ছুক শিশুদের অভিভাবকদের কোনও ভিড় দেখা যায়নি রাজধানীর স্বনামধন্য স্কুলগুলোয়। ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত থাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল নিষ্প্রাণ।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, গতকাল দেশের সব সরকারি স্কুলে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। এ বছর রাজধানীতে পুরনো ২৪টি সরকারি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সদ্য নির্মাণসম্পন্ন ৪টি বিদ্যালয়।

গতকাল বেলা ১১টায় রাজধানীর মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, ফরম বিতরণের জন্য ৮-৯টি বুথ খোলা হয়েছে। কিন্তু কোনও বুথে অভিভাবকদের ভিড় নেই। স্কুলের শিক্ষকরা জানান, অবরোধের জন্য অভিভাবকরা ফরম নিতে আসেননি। দুপুর সাড়ে ১২টার সময় ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুলে ফরম নিতে আসা আরিফুর রহমান বলেন, অবরোধের দিন হওয়ায় কোনও ভিড় নেই। এসেই বুথ ফাঁকা পেয়ে ফরম নিয়ে যাচ্ছি। এই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা অবরোধের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে দুপুর দেড়টায় গিয়ে স্কুলের ফরম বিতরণ কেন্দ্রে কোনও অভিভাবককে দেখা যায়নি। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসরিন সুলতানা জানান, অবরোধের জন্য দূরের অভিভাবকরা আসেননি।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন গতকাল আমাদের সময়কে জানান, রাজধানীতে সরকারি ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হবে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে। এগুলো হচ্ছে– রাজধানীর হাজারীবাগে শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুরের দুয়ারীপাড়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তরায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ডেমরায় হাজী এম এ গফুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

এসব বিদ্যালয়ে আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ফরম বিতরণ ও জমা নেওয়া হবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্কুলে এই ফরম বিতরণ করা হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি ফরমের মূল্য এবারও ১০০ টাকা। সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি ৭০০ টাকার বেশি হবে না।

আমাদের সময় ০২.১২.২০১৩

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তর অনুমোদনের অপেক্ষায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি অধিদপ্তর হচ্ছে, সরকার এ কথা বলছে ২০১০ সাল থেকে। বর্তমানে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে বিলুপ্ত করে অধিদপ্তর গঠনের কাজও প্রায় চূড়ান্ত। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন এবং তারপর সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে অধিদপ্তর আলোর মুখ দেখবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রত্যাশা ছিল, আজ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অধিদপ্তরের যাত্রা শুরুর ঘোষণা দেবেন। তবে তা হলো না। কেননা বিষয়টি অনুমোদনের জন্য এখনো উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বৈঠকে উত্থাপিত হয়নি।

২০১০ সালের আগস্ট মাসে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনকে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়। এ অধিদপ্তর গঠিত হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২ এপ্রিল অটিজম দিবসের অনুষ্ঠানে সে কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানান।

তবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে বিলুপ্ত করে অধিদপ্তর গঠনের বিষয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত এনজিওগুলোর জোট জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম। ফোরামের সভাপতি রজব আলী খান বলেন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল। সরকার এ প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত না করে অধিদপ্তর করলে তা বেশি ফলপ্রসূ হতো।

বাংলাদেশি সিস্টেমস চেঞ্জ অ্যাডভোকেসি

নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সালমা মাহবুব বলেন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে অনেক কিছুই করার কথা ছিল। তবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সে সুযোগ-সুবিধা পায়নি।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবীর বলেন, ফাউন্ডেশন অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা এনজিওগুলোর কথা বলার সুযোগ সীমিত হয়ে যাবে, কথাটি ঠিক নয়। ৬৪ জেলার ৬৮টি প্রতিবন্ধী সেবা সাহায্য কেন্দ্রসহ অন্যান্য কার্যক্রম প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যানারে পরিচালিত হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকবে।

প্রথম আলো ০৩.১২.২০১৩

সারা দেশে চলছে শিক্ষামূলক যাত্রানুষ্ঠান

দেশকে নিরক্ষুরমুক্ত করতে হবে, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে। গ্রামেগঞ্জে হতদরিদ্র মানুষের মাঝে– এই ভাবনা সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা সচেতনতামূলক যাত্রা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান। অনুষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধান করছে দেশ অপেরা। সমন্বয় করছেন মিলন কান্তি দে। সম্প্রতি গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে দেশ অপেরার একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়েছে।

জানা গেছে, মা-মাটি-মানুষ, একটি পয়সা, মেঘে ঢাকা তারা পালাগুলোর আটটি প্রদর্শনী হবে দেশের আটটি জেলায়। শুরুতে ৩ ডিসেম্বর জয়পুরহাটে, ১০ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জে, ১১ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জে এবং ১৮ ডিসেম্বর দিনাজপুরে এই শিক্ষা সচেতনতামূলক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

ইত্তেফাক ০৩.১২.২০১৩

এক্সপার্ট এডুকেটরস অ্যান্ড মেন্টর স্কুলের নাম ঘোষণা মাইক্রোসফটের

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা বদলে দিয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক ও স্কুলগুলোকে বিশ্বমানের লিডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি পদক্ষেপ 'এক্সপার্ট এডুকেটরস অ্যান্ড মেন্টর স্কুল। মাইক্রোসফট বাংলাদেশ অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলাদেশ থেকে একজন শিক্ষক ও একটি স্কুল মাইক্রোসফটের 'এক্সপার্ট এডুকেটরস অ্যান্ড মেন্টর স্কুলস প্রোগ্রাম'–এ অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। ওই প্রোগ্রামদ্বয়ে সদস্যরা এক বছরের একটি বিশেষ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করবে যা তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা বদলে দেয়া একজন দক্ষ প্রশিক্ষক এবং স্কুল লিডার হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

এডুকেশন অ্যাট মাইক্রোসফটের ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্থনি সালসিটো বলেন, '২১ শতকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তোলার জন্য কীভাবে কোনো ব্যক্তি অথবা স্কুল প্রযুক্তির ব্যবহার করছে মাইক্রোসফট এক্সপার্ট এডুকেটরস অ্যান্ড মেন্টর স্কুল তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা ক্লাসরুমে কেবল উদ্ভাবনমূলক কিছু কর্মকাণ্ডের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকছেন না, বরং অন্যদের উৎসাহ প্রদান এবং নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলে দিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। সহকর্মীদের মাঝে তারা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন এবং আমরা আশাবাদী তারা মাইক্রোসফটের চলতি প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে প্রযুক্তির সান্নিধ্যে এসে আরও উপকৃত হবেন।'

আলোকিত বাংলাদেশ ০৫.১২.২০১৩

শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে বিশেষ প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার শতকরা ৯০ ভাগ। এর মধ্যে ৫০ ভাগেরও বেশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। এরা প্রাথমিকেই ঝরে পড়ে। আবার মাধ্যমিকে ভর্তি হলেও দশম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। শিক্ষার্থীদের এই ঝরে পড়া রোধ করতে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষায় গুণগতমান ও প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি (সেকায়েপ) বিষয়ক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের সফলতাও পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গঠিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া, ক্লাস পরিদর্শন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের উন্নয়নসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রকল্পের সফলতার জন্য বিশ্বব্যাংক আড়াইশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থ বাড়িয়ে এর মেয়াদ ২০১৪ সাল থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৭ সাল পর্যন্ত করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও বেতন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগ ছাত্রী। ফলে ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসার প্রবণতা এবং টিকে থাকার প্রবণতা বাড়ছে। গণিত ও ইংরেজিতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা দূর করতে গত বছরের জুন-জুলাই হতে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হচ্ছে। দেশের ৩৭টি জেলার ৫৫টি উপজেলার ৪শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হচ্ছে। বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর জন্য চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত ৬ হাজার শিক্ষার্থী এর সুবিধা ভোগ করেছে।

প্রকল্পের আওতায় ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৬৩৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮৪ কোটি ২৫ লাখ ৩১ হাজার ৭৩০ টাকা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে এবং ১০ কোটি ৪৭ লাখ ১০ হাজার ২৩০ টাকা টিউশন ফি দেয়া হয়েছে ১০ লাখ ৭৬ হাজার ৯৩৬ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে। ব্যানবেইসের তথ্যমতে, ২০০৫ সালে স্কুল পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১১ দশমিক ৭ শতাংশ, সপ্তম শ্রেণীতে ১২ দশমিক ৩ শতাংশ, অষ্টম শ্রেণীতে ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ এবং দশম শ্রেণীতে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। তবে ২০০৭ সালে এই হার কমলেও ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যথাক্রমে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ, ৯ শতাংশ, ১৪ দশমিক ২ শতাংশ, ১২ দশমিক ২ শতাংশ এবং ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ।

ইত্তেফাক ০৫.১২.২০১৩

পাবলিক পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা পাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসক ড. আবুল কালাম আজাদের একান্ত ইচ্ছায় আগামী বছর ২০১৪ সাল থেকে সকল পাবলিক পরীক্ষায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা শুধু মাত্র সরকারি ফি দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। জেলা প্রশাসক নেত্রকোণা জেলার সকল সরকারি বেসরকারি কলেজ স্কুলসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিকট এই মর্মে গত বৃহস্পতিবার চিঠি প্রদান করেছেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নেত্রকোণা জেলাধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়রত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় (এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিগ্রী) অংশগ্রহণ করতে পারছে না মর্মে জেলা প্রশাসককে জানানো হলে তিনি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে চিঠি দেন। জেলার মুক্তিযোদ্ধাগণ জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ইত্তেফাক ১৫.১২.২০১৩

দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা

গণসাক্ষরতা অভিযান গত ২৪-২৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজন করে। এই কর্মশালার

উদ্দেশ্য ছিল নব্যসাক্ষর ও সীমিত সাক্ষর পাঠকদের মধ্যে নিয়মিত পাঠ্যচর্চার মাধ্যমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি দক্ষতার প্রসারের জন্য কারিগরি বিষয়ে অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে ধারণার উন্নয়ন করা।

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেমন- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, হাউস বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেইস মিতালি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ন্যাশনাল কলেজ অফ হোম ইকোনোমিকস, ব্র্যাক, আরডিআরএস বাংলাদেশ, কেয়ার বাংলাদেশ, শার্প-সিরাজগঞ্জ, এফআইভিডিবি, মটস্-কারিতাস, সিএমইএস, টিএমএসএস, বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি, গণউন্নয়ন কেন্দ্র-গাইবান্ধা, পিআরডিএস, দীপশিখা-দিনাজপুর থেকে ১০ জন নারীসহ মোট ২৩ জন প্রতিনিধি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীগণ দলীয়ভাবে পোশাকে জরি-চুমকি ও কারচুপির কাজ, ড্রিলিং মেশিনের যাদু, লেদ মেশিনের গল্পকথা, পাওয়ার টিলার ও সেলো মেশিন চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সিউইং মেশিন চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রির কাজ, গৃহকর্মে নৈপুণ্য বিষয়ে ৭টি অব্যাহত শিক্ষা উপকরণের খসড়া উন্নয়ন করেন।

এ কর্মশালায় এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী ও যুগ্ম-সচিব জীবন কুমার চৌধুরী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মহসীন, উপকরণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও ফ্রিল্যান্স গবেষক ড. শাহীদা আখতার, শিক্ষাক্রম ও জেন্ডার এক্সপার্ট আইনুন নাহার বেগম, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কার্যক্রম ব্যবস্থাপক তপন কুমার দাশ, উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন ও জামিল মুস্তাক রিসোর্স পার্সন হিসেবে বিভিন্ন ধারণাপ্রদায়ী অধিবেশন পরিচালনা করেন।

আবু রেজা

কিশোর-কিশোরী প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য অধিকার: গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশই কিশোর-কিশোরী। প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর জানার অধিকার রয়েছে তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে। আর এই তথ্যগুলো যদি বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা, টিভি ও এফএম রেডির মাধ্যমে প্রচার করা হয় তাহলে তা আরও কার্যকরী হতে পারে- এই ভাবনা হতেই গণসাক্ষরতা অভিযান অক্সফাম-এর সহায়তায় কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বিস্তারে গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করতে ৩০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক-এর সহায়তায় সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় "১১-১৯ বেড়ে ওঠা কিশোর-কিশোরী প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা" শীর্ষক একটি এ্যাডভোকেসী সভা। সিলেটের স্থানীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশন মাধ্যমের কর্মীরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেরী স্টোপস-এর জেনারেল ম্যানেজার ডাঃ মো. শফিকুল ইসলাম। তিনিই মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে, এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে পত্রিকা পৌঁছাতে পারে না, কিন্তু প্রতিটি ঘরেই টেলিভিশন ও মোবাইলে এফএম রেডিও থাকে যার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ

এবং এই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য দেয়া যেতে পারে। তবে তা হতে হবে আনন্দদায়ক যাতে করে বিষয়টিকে তারা কঠিনভাবে না নেয়।

খালেদা হাবীব

প্রশিক্ষণ/ ওরিয়েন্টেশন
প্রাক্-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রয়োগ

গত ১৭ -২২ নভেম্বর ২০১৩ তে অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা (ইসিসিই) কার্যক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ। ৬ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাক্-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রম এর ধারণা উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমতা বৃদ্ধি। গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত এ

প্রশিক্ষণে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত ১২টি সংস্থার ২৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে শিশু অধিকার, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিশু বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ, শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও প্রয়োজনীয় দিক- খেলার গুরুত্ব, সৃজনশীলতা, বিদ্যালয় যাবার প্রস্তুতি, ইসিসিডি কার্যক্রমের ধারণা ও বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে অধিবেশনে আলোচনা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা গাজীপুরে প্ল্যান বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত ৩টি ইউনিয়নে ৩টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং ৩টি প্রি স্কুল পরিদর্শন করা হয়।

প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডা: আসিরুল হক, ইসিডি স্পেশালিস্ট জান্নাতুন নাহার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর তারিকুল ইসলাম চৌধুরী, লালমাটিয়া গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের তাহামিনা মোমেন, গণসাক্ষরতা অভিযানের তপন কুমার দাশ, মোশাররফ হোসেন এবং তনুজা শর্মা। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

তনুজা শর্মা

জনযোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ে ক্যাম্পেইন

গত ৫-৩০ ডিসেম্বর ২০১৩ জনযোগাযোগ (পপুলার কমিউনিকেশন) ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের স্কুলে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষা সমাপনের উপর দেশের ৭টি

বিভাগের ২০টি জেলায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে একটি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পেইনে প্রতিটি জেলাতে একটি করে রিক্সা র‍্যালী ও অভিভাবকদের নিয়ে ২০টি জেলায় ৬০টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়। প্রতিটি উঠান বৈঠকে ২৫-৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন। ২০টি জেলার ২০টি বর্ণাঢ্য রিক্সা র‍্যালীতে সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

আবেদা সুলতানা

প্রাক্ শৈশব যত্ন ও শিক্ষা: আমাদের করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গত ২৩ নভেম্বর ২০১৩ গণসাক্ষরতা অভিযান ও পিপল্ এ্যাডভান্সমেন্ট সোশ্যাল এসোসিয়েশন (পাশা) মানিকগঞ্জ এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় প্রাক্-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা: আমাদের করণীয় বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা। সভাটি মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা (ইসিসিই) বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, এর গুরুত্ব অনুধাবন এবং এই কার্যক্রমের প্রসার ঘটানোর জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. আসলাম হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মানিকগঞ্জ-এর এসএম মোস্তাফা কামাল এবং সভায় সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন।

সভায় মূল আলোচনা পত্র উপস্থাপন করেন মানিকগঞ্জ-এর বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম এবং নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খানবাহাদুর আওলাদ হোসেন কলেজ-এর প্রভাষক রাহুল জামান সুজন, প্রশিক্ষক, সিসিমপুর আউটরীচ প্রকল্প এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ প্রকল্প। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের ৭০ জন প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তনুজা শর্মা

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩ ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার-এ এডুকেশন ওয়াচ স্টাডি-২০১৩ এর "State of Pre-Primary Education in Bangladesh" শীর্ষক

গবেষণার প্রথমিক ফাইন্ডিংসসমূহের ওপর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী। এছাড়া সভায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, ইসিসিডি নেটওয়ার্ক এবং অভিযান-এর সদস্যসহ ২৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় গবেষণার প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংসসমূহ উপস্থাপন করেন সমীক্ষার মূল গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ। বিশেষ বিশেষ ফলাফলসমূহ

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শহরে মোট ভর্তি এবং নিট ভর্তির হার বেশি, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ভর্তির হার বেশি এবং গড়ে ৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেশি।
- কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেশি এবং সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির হার প্রায় সমান। এনজিও স্কুলগুলোতে নারী শিক্ষকের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।
- বিগত ৫ বছরের (১৯৯৮-২০১৩) মধ্যে ২০০৮ সাল থেকে মোট ভর্তি (৭৭.৯%) এবং নিট ভর্তির (৪০.৪%) হার বেড়েছে এবং সব স্তরে এই হার বেড়েছে। শহরের মাধ্যমিক ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাইভেট পড়ার হার বেশি এবং মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের প্রাইভেট পড়ার হার বেশি। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রাইভেট পড়ায় বেশি ব্যয় হয়।
- এনজিও স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী উপস্থিতির (৭৮.৬%) হার বেশি এবং কিন্ডারগার্টেন (৭৩.১%) ও মাদ্রাসা (৭০%) স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার প্রায় কাছাকাছি। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা ও শিখন পদ্ধতিতে ৪৪ ভাগ শিক্ষকের কোন প্রশিক্ষণ নেই এবং ৩৫.১ ভাগ শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় কোন প্রশিক্ষণ পাননি।
- মাদ্রাসাভিত্তিক স্কুলগুলোতে কোন শিক্ষা উপকরণ নেই এবং অন্যান্য স্কুলগুলোতে শিক্ষা উপকরণের মধ্যে চার্ট এর ব্যবহার বেশি।

উম্মে সায়কা

৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে এনসিটিবি প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের তথ্যগত ত্রুটি, বানান ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত সংকলিত করে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পর্যালোচনার অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কক্ষে সংশ্লিষ্ট পর্যালোচকদের নিয়ে একটি অগ্রগতি যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর অনুষদের প্রাক্তন পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুর রহমান। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনাকারীবৃন্দ সভায় উপস্থিত থেকে মতবিনিময় করেন।

৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার অগ্রগতি যাচাই এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন এনসিটিবি বরাবর উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পর্যালোচকদের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার কাজ সম্পাদন করে দ্রুততম সময়ে গণসাক্ষরতা অভিযানে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়।

মির্জা মো. দেলোয়ার হোসেন

১০ ডিসেম্বর ২০১৩

আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

নিশ্চিত হোক মানুষের সকল মানবাধিকার

পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ আজ তাদের শপথ পুনর্ব্যক্ত করছে
প্রতিটি রাষ্ট্র আজ অঙ্গীকারবদ্ধ: কোন ব্যক্তির মানবাধিকার যেন লঙ্ঘিত না হয়

কিন্তু আজও অহরহ মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটেই চলেছে
লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে
অবদমিত হচ্ছে গণমানুষের মৌলিক অধিকার

আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই
চাই মানসম্মত শিক্ষা, চাই নিরাপদ পরিবেশ
চাই বিশ্বজনীন মানবাধিকারের বাস্তবায়ন

আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে

আমাদের দাবি

- সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা সকল রাজনৈতিক (সরকারী বা বিরোধী) দল কর্তৃক আহূত যে কোন ধরনের নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে রাখতে হবে
- পরীক্ষার সময় হরতাল/অবরোধ জাতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়া যাবে না
- কোন রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিশু-কিশোরদের কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না
- সব ধরণের সহিংসতাই মানবাধিকারের লঙ্ঘন, সকলকে অবশ্যই সহিংসতা পরিহার করতে হবে
- রাষ্ট্রকে অবশ্যই সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, স্বাভাবিক জীবনযাপন ও স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে
- সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- অবিলম্বে শিক্ষা অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে এদেশের সকল নাগরিকের, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে তাদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে দলমত নির্বিশেষে এই হোক সকলের দাবি

সহিংসতা নয়, সকল ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা— বৈষম্য নয়, সকলের সমঅধিকার

এই হোক আমাদের অঙ্গীকার

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৩৫ পৌষ ১৪২০ ডিসেম্বর ২০১৩

বিজয় দিবস সংখ্যা

সম্পাদক

২০১৩ সালের প্রস্থানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যদি বলতে পারতাম, কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি, তাহলে হয়ত ভালই হত। হিসেব-নিকেশ তো কখনই ঠিকমত মেলে না, বিশেষত আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে, ভাগ্যের সঙ্গে সদাযুদ্ধরত আমাদের মত অভাজন ব্যক্তিদের কপালে। সেকথা জেনেও তো আশ্বস্ত বা উদাসীন বোধ করতে পারি না। যাই হোক, জানুয়ারি মাসে সেই সব কথার পর্যালোচনা করা যাবে। প্রায় অপরিহার্য বেদনার ধারাভাষ্য না হয় তখনই রচনা করা যাবে।

বেদনার বিষয়টাই প্রধান হয়ে ওঠে এইজন্য যে, সারাটা ২০১৩ জুড়ে আমরা নানারকম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেছি। আমাদের জীবনে কোন নির্দিষ্ট ছন্দ ছিল না, কোন পরিকল্পনার ছক নিয়ে আমরা কোন কাজ করতে পারিনি। এবং তা জাতীয়, সামাজিক, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত সকল পর্যায়ে। বর্তমান জীবনযাত্রাকে এখন আমরা সবাই অরাজক বলেই বিবেচনা করি। সহিংসতা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বিশেষভাবে ব্যাহত করেছে। আর এমন দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বাস করার অভ্যাসে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি আমাদের অনিবার্য নিয়তি। রক্তপাত, হানাহানি, সংঘর্ষ, কলহ-বিবাদ, অশোভন এবং অহেতুক বাদানুবাদ আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করেছে। এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে আপোস করতে হয়েছে গণসাক্ষরতা অভিযানকেও। চেষ্টা করেছি, যাতে আমাদের কাজের গুণগত মান ক্ষুন্ন না হয়। তবে বার বার নানান হঠকারী রাজনৈতিক কর্মসূচির হুমকিতে পড়ে পরিকল্পিত সাফল্যের মাত্রা অর্জন করতে পেরেছি কি না, তা নিয়ে একটা দিশেহারা ভাব জন্ম নিয়েছে। একেবারে বৈষয়িক, বাস্তব এবং অনিবার্য কারণে আমরা এবছর *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর এপ্রিল, মে ও জুন সংখ্যা প্রকাশ করতে পারিনি।

ডিসেম্বর মাসের *বুলেটিন*-এর আয়োজনে সঙ্গত কারণেই আমাদের প্রাধান্য থাকে মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবসের ওপর। এছাড়া রোকেয়া বিষয়ে একটি রচনা গ্রন্থনার ওপর জোর দিয়ে থাকি। এটা একটা ঐতিহ্যসিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এবারের পরিকল্পনায়ও তার তেমন কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে বিজয় দিবসের ওপর সাধারণভাবে কলেবরের দিক থেকে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে, এবারে তার অনুপাতটা একটু কম। তার কারণটা একেবারেই আকস্মিক ও অনিবার্য। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে আমাদের সকলকে অশ্রুস্নাত করে, বেদনার আবহে নির্বাক করে চলে গেলেন সমকালের মহানায়ক নেলসন মাণ্ডেলা। শোকস্তব্ধ বিশ্ব অদৃশ্যপূর্ব ভঙ্গিতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর এই সংখ্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে এক অপরিহার্য দায়বোধ হিসেবেই আমরা গণ্য করেছি। বিশ্ববাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার প্রতি সালাম জানাই। অনিবার্য কারণে এবার মে মাসে *বুলেটিন* প্রকাশিত না হওয়ায় রীতিমাফিক আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এবছর কোন লেখা পত্রস্থ করতে পারিনি। তদুপরি, ২০১৩ সাল হল *গীতাঞ্জলি*-র নোবেল পুরস্কারে বিভূষিত হবার শতবর্ষ। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক লগ্নটাকে স্মরণ করে আমরা একটা মিতকলেবর রচনা নিবেদন করলাম।

সাক্ষরতা বুলেটিন-এর পাঠকদের জন্য খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধুরী

প্রচ্ছদ
মানবপতাকা সৃজনের শিল্পকর্ম

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ• ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org